অর্ব্বাচীনদের অনুগৃহীত জীব। অনুগ্রহের মর্য্যাদা না রাখিতে পারিলে, তাহারা আবার তলাইয়া যায়—কোথায় এবং কি ভাবে, সে-সংবাদ মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্তকথায় পাওয়া যায় না।

অশোক সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ পাশ সে করিয়াছে, অভিজাত বংশের ছেলেদের সঙ্গে সে মেলামেশাও করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের তালে সে চলিতে শেখে নাই। তাহাদের বেসুরা তাল তাহাকে পীড়া দেয়, অথচ তাহাদের বেসুরা জীবন তাহাকে আকর্ষণ করে। মানুষ যেখানে অপূর্ণ, সেইদিকে তাহার তৃষ্ণা থাকে বেশী। অশোক ধনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার উপর অসন্তুষ্ট—কারণ, সেখানে সে শ্রমিক, যথার্থ মূল্য সে পায় না। যে-সভ্যতার ষ্টীমরোলারে সে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট, তাহার গতিতে ছন্দ নাই—মনে হয় কোথাও যেন যতি বা সম নাই। কিন্তু সেই বিধি-ব্যবস্থার উচ্চ আসনে যাহারা অবস্থিত, তাহাদের প্রতি লোভও তাহার কম নাই। সেই ব্যবস্থার আকর্ষণ অশোককে টানে, কিন্তু তাহাদে অবিচার তাহাকে পীড়া দেয়। এই দোটানার আন্দোলনে অশোকের অন্তর মথিত ও ব্যথিত। সে শক্তিহীন, তাই দয়াহীন নিষ্ঠুরতার সুযোগ তাহার নাগালের বাইরে। সে দুর্ব্বল, তাই প্রলোভনে তাহার অন্তরের শূন্যতা ভরিয়া উঠে, কর্ম্মের পথে বিঘ্ন ঘটায়।

গড়িয়াহাটার মোড়ে অশোক ট্রাম ধরিল। ট্রামে যাত্রী কম। শীতের রাত্রি, চতুর্দ্দিকে ক্লান্ত মৌনতা। এমনি সময়ে

মানুষের নিজের ব্যথা স্মরণ-পথে উদিত হয়। অশোক "ক্যালকাটা ক্রনিকল" দৈনিক সংবাদপত্রে কাজ করে। মাহিনা পায় পঁচাত্তর টাকা, কিন্তু তাহাও বাকি থাকে। দুই মাসের মাহিনা এখনও সে পায় নাই, পাইবে বলিয়া ভরসা পাইয়াছে। "ক্যালকাটা ক্রনিকল" কংগ্রেসের মুখপত্র। কংগ্রেস নেতারা হয়তো ভাবেন যে, কংগ্রেস সেবায় আবার অর্থের দাবী কেন! যাহারা নেতা হইয়াছেন, দেশের কর্ম্মীদের নিকটে সেবা পাইবার অধিকার তাহাদের জন্মিয়া গিয়াছে। সেবা করিতে কর্ম্মীরা কুণ্ঠাবোধ করিলে, "দেশদ্রোহী" বলিয়া তাহারা আখ্যাত ও ব্যাখাত হইবে কিন্তু কর্ম্মের বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য চাহিলে নেতারা অসন্তোষের আগুনে জ্বলিয়া উঠেন। দেশপ্রেমের যুপকাষ্ঠে কর্ম্মীদের বলি দেওয়া স্বাদেশিকতার প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত। পারিপার্শ্বিক অন্যায় আবর্জ্জনাকে অস্বীকার করিয়া প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা, কল্যাণকর প্রচেষ্টার দ্বারা দেশবাসীর অন্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি কোন নেতার নাই। ফাঁকি দিয়া যাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ফাঁকির কবল তাঁহারা এড়াইতে পারেন না। তাই নেতা ও কর্ম্মীর মিলনক্ষেত্র দেশসেবা নয় এবং নেতা ও কর্ম্মীর বিকৃত সম্বন্ধ দেশের আলোককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

অশোক ভাবিতে লাগিল যে, দেশ-সেবায় তার নিষ্ঠা নাই অর্থ হইল প্রয়োজনের। মানুষের প্রয়োজন অর্থ ব্যতীত মিটে না, অন্ততঃ বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থা যতদিন বহাল থাকিবে।

যেদিন এমনি ব্যবস্থা হইবে যে, মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজ
সমষ্টিগতভাবে নিবারিত হইবে, তখন প্রয়োজনের তীব্র কষাঘাে
ব্যক্তি জর্জরিত হইবে না। মানুষ যখন সমষ্টিগতভাবে ভাবি
এবং সব প্রয়োজনের ভার সমাজের উপর ন্যস্ত থাকিবে, ত
সমাজে স্তর বিভাগ থাকিবে না। অশোক ধনতান্ত্রিক যুে
শোষণের প্রতীক সেই ট্রামে বসিয়া শ্রেণী-হীন সমাে
পরিকল্পনায় তন্ময় হইয়া গেল। তাহার একটু তন্দ্রা আসি
স্বপ্নের ঘোরে তাহার মনে হইল যে, সে এই শোষিত ও শাি
সম্প্রদায়কে ন্যায্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতি
হইয়াছে। বাস্তবিক, যে খাটিবে তাহার ক্ষুধা মিটিবে না,
রহস্য তাহার মনের দুয়ারে বার বার করিয়া আঘাত কি
লাগিল। কিন্তু সে-রহস্য তাহার কাছে ধরা দিল না। দে
অর্থ ধনী-বেকার শুষিয়া লইতেছে তাহাদেরই সাহায্যে, য
তাহাদের উপর এই যে জবরদস্তি—আইনে তাহার
প্রতিবিধান নাই, সমাজে তাহার প্রতিবন্ধক নাই, র
জীবনে তাহার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন নাই। তবুও ে
যায় যে, কংগ্রেস আছে, রাজনীতি আছে, আন্দোলন আছে

অশোকের তন্দ্রার ঘোর ভাঙিল, স্বপ্নের আমেজও ন
হঠাৎ সে পকেটে হাত দিল, দেখিল যে তাহার সদ্য লি
গল্পটি আছে কি না। এই গল্পটিই এখন তাহার
লেখাটি কাল সে কোন মাসিক কাগজে ছাপা
টাকা আদায় করিবে। তাহার উপর ন

শোভনাকে বাজারের টাকা দিবে বলিয়া আসিয়াছে। অফিস হইতে মাহিনা পাওয়ার স্থিরতা নাই। অথচ, অফিসে না গেলে বেকারের দলভুক্ত হইতে হইবে। তাই সে অফিসে যায়, কাজ করে এবং বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীকে বিশ্বের দারিদ্র্যের ইতিহাস শুনাইয়া শান্ত করে। দরিদ্রের স্ত্রীরা সহজেই খুসী হয় বলিয়া তাহাদের সংসার মচকাইলেও ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায় না।

অশোক অফিসে আসিয়া দেখিল যে, খবরের কাগজের অফিসের দিনের হট্টগোল থামিয়া গিয়াছে। সে রাত্রের কাজ ভালবাসে—কারণ, রাত্রে উপরওয়ালার কড়া শাসন থাকে না এবং নিজের স্বাধীনতার পরিসর থাকে বেশী। তাহার সহকারী শিশির বোস টেবিলে কাজ করিতেছে। পাশের ঘরে প্রুফ-সংশোধকের দল রাজনীতি লইয়া জটলা করিতেছে। এত বড় বাড়ী, দোতালায় আর কেহ নাই। নীচের তলায় প্রেস এবং কর্ম্মচারীরা কাজে ব্যস্ত—সেখানে লাইনো মেসিনের টকাটক্ শব্দ, রোটারীর ঘর্‌ঘর্‌ গর্জ্জন, ষ্টিরিয়োটাইপ প্লেট ঠিক করিবার ঠকাঠক্ আওয়াজ এবং প্রিন্টার মহাশয়ের অহেতুক ব্যস্ততা।

অশোককে দেখিয়া শিশির বলিল, এতো দেরী করলে! বিলেতে কয়লা ধর্ম্মঘটের অনেক সংবাদ আছে, সাজিয়ে "সামারি" লিখে ফেলতে হবে। আবার শুনছি যে, এ্যাডভোকেট জেনারেল মৃত্যু শয্যায়—তিনি মারা গেলে তাঁর জীবনী লিখতে হবে।

অশোক ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, দিনের লোকেরা জী
লিখে রাখেনি ? এমন অসময়ে মরলে, শুধু মৃত্যু সংবাদই যাবে

অশোক তাহার চৌকিতে বসিয়া দেখিল যে, সম্প
মহাশয় অনেক জরুরী আদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, যথা
সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কি কি যাইবে এবং কি কি যাইবে না।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, শিশির, তুমি এ্যাডভো
জেনারেল সম্বন্ধে কিছু জান ?

শিশির হাসিয়া বলিল, তিনি নিশ্চয়ই আইনজ্ঞ, আর শুনে
তাঁর স্ত্রী খুব সুন্দরী।

ডান চোখটা ঈষৎ ছোট করিয়া অশোক কহিল, যাক, ঐ
স্ত্রীর খাতিরেও অন্ততঃ তাঁর জীবনী একটু ভালভাবে যাও
উচিত।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

—হেলো, ক্রনিকল স্পিকিং।

—আমি এসোসিয়েটেড্ প্রেস। বিলেতে কয়লার ধর্ম্ম
সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রীর একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠাচ্চি
তিন কলম জায়গা রেখে দেবেন।

—আচ্ছা, ধন্যবাদ।

প্রিণ্টার আসিয়া বলিল, সাতের পাতায় কি কি যাবে
অনুগ্রহ করে দেখিয়ে দেবেন।

অশোক রাগের সুরে কহিল, এখনও সাতের পা
তৈরী হয় নি ?

প্রিণ্টার বলিল, দিনের বেলায় বেশী কম্পোজ হয় নি!

অশোক অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, কাল থেকে আমি সাতের পাতা দিনের বেলায় তৈরী দেখতে চাই।

প্রিণ্টার খুসী হইয়া কহিল, আপনি দিনের লোকদের অনুগ্রহ করে লিখে রেখে যাবেন।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং

—হেলো, ক্রনিক্‌ল স্পিকিং।

—এ্যাডভোকেট জেনারেল এইমাত্র হার্ট-ফেল করে মারা গেলেন। আপনাদের একজন রিপোর্টার পাঠিয়ে দেবেন?"

—আপনি কে, অনুগ্রহ করে বলবেন।

—আমি মিঃ দাস—এ্যাডভোকেট জেনারেল আমার ভগ্নীপতি।

—থ্যাঙ্ক-উ!

অশোক টেলিফোনের হাতলটা রাখিয়া বলিল, যাই-হোক, বারোটার আগেই মারা গেছেন, তা' না হ'লে তো জীবনী লেখাই বিষম দায় হ'তো।

এতো রাত্রে কোন রিপোর্টার নাই। অশোক প্রুফ-রিডারের একজনকে পাঠাইয়া দিল শুধু জানিয়া আসিতে যে সত্যিই এ্যাডভোকেট জেনারেল মারা গিয়াছেন কি-না। রাত্রিবেলা কোন রিপোর্টারের বন্দোবস্ত করা হয় নাই বলিয়া অশোক সংবাদ-সম্পাদকের বিবেচনা শক্তির তারিফ করিতে পারিল না। টেলিগ্রামগুলি শিশিরের ঘাড়ে চাপাইয়া

দিয়া সে এ্যাডভোকেট জেনারেলের জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিল। অফিসে এমন কোন বই নাই যেখানে এ্যাডভোকেট জেনারেল সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায়। দিনে যাহারা কাজ করিয়াছে, তাহারাও কোন বন্দোবস্ত করিয়া যায় নাই। তবুও তাহাকে লিখিতে হইবে—কাগজের মালিকেরা কংগ্রেস্‌ নেতা হইলেও এ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রতি সুবিচার করিতে কোনদিন কার্পণ্য করেন নাই।

অশোক জানিত যে জীবনী লেখা খারাপ হইলে নিন্দা উঠিবে, কিন্তু সুলিখিত হইলে কোন প্রশংসার কথা উঠিবে না। সবচেয়ে বড় তথ্য সে জানিয়াছে যে, তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী এবং একদিন জলসায় তাহার মেয়ের গান সে শুনিয়াছিল। মেয়েটির মধ্যে বিলিতি ঢং থাকিলেও স্বদেশী মনের প্রলোভনের বস্তু ছিল প্রচুর। এই দুই তথ্যের শিলাখণ্ডের উপর তাহার চিন্তা আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। অশোক লিখিতে লিখিতে যেন নতুন উদ্দীপনা লাভ করিল এবং এ্যাডভোকেট জেনারেল সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ আলোচনা লিখিয়া ফেলিল। রাত্রে কাজ করিবার এক সুবিধা যে, সে যাহা লিখবে, তাহাই ছাপা হইবে। দুঃস্থ সাংবাদিক জীবনে এই লোভ অবহেলার বস্তু নয়।

অশোক প্রিন্টারের হাতে লেখা দিল, প্রিন্টার বিস্মিত হইয়া বলিল, এতো লেখা যাবে!

অশোক বলিল, যাবে বৈ কি! টেলিগ্রামের পাতায় যাবে।

প্রিণ্টার কহিল, যদি কাগজ দেরী হয়ে যায় ?

অশোক মুস্কিলে পড়িল। কাগজ দেরী হইলে পরদিন ম্যানেজার আসিয়া গণ্ডগোল করিবে—সম্পাদকীয় বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইবে। ম্যানেজার কাগজের বিষয়-বস্তুর দায়িত্ব বোঝে না। সে জানে, কাগজ ঠিক সময় বাহির হইলে এবং ঠিক সময় ট্রেনযোগে প্রেরিত হইয়া থাকিলেই সম্পাদকীয় বিভাগ ভাল কাজ করিতেছে—নহিলে, তাহারা অযোগ্য। সংবাদের গুরুত্ব বুঝিবার প্রবেশদ্বার তাহার মস্তিষ্কে চিররুদ্ধ।

তবুও অশোক বলিল, যদি একান্তই হয়, তা' হবে।

অশোকের ইচ্ছা হইল না যে, সে তাহার লেখাটা একটু সংক্ষেপ করিয়া দেয়। লেখকের দুর্ব্বলতা এডিটার অশোককে পাইয়া বসিল। যে-নিষ্ঠুরতা সে পরের লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করে, আজ সে-নিষ্ঠুরতা নিজের লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইল। অশোক অনুভব করিল যে জার্ণালিষ্ট হওয়ার এখানেই চরম সার্থকতা।

এমনি সময় একজন সাহেবী পোষাকধারী বাঙ্গালী ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি মিঃ চাটার্জ্জি, এ্যাডভোকেট জেনারেল সম্বন্ধে একটা ষ্টোডি লিখে এনেছি। আমি তাঁরই বন্ধু-ব্যারিষ্টার।

অশোক বসিতে ইঙ্গিত করিয়া একটা সিগারেট জ্বালাইয়া বলিল, আপনার একটু দেরী হয়ে গেছে, আজকের কাগজে জায়গা নেই।

এতবড় ষোল পাতার কাগজে তাহার এক কলম জীবনীর স্থান হইবে না, এই কথাটা মিঃ চাটার্জ্জি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, ওটা ফাঁকি দিবার কথা, সত্যি কথা নয়।

মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, আপনাদের এডিটার আমাকে লিখতে বলেছিলেন।

অশোকের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। সে চট্ করিয়া বলিল, তাহলে, তাঁকেই লেখাটা দেবেন।

মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, কিন্তু রাত্রে অফিসে দিয়ে যাবার জন্য বলেছিলেন।

অশোক হঠাৎ কাজে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, এতো দেরীতে এসেছেন যে, আর উপায় নেই।

মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, কিন্তু আমার লেখাটা খুব ছোট।

অশোক হাসিয়া বলিল, বড় হ'লে তো আমরা ছাপতেমই না।

মিঃ চাটার্জ্জি বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, কেন? তিনি তো বাংলার একজন কৃতী সন্তান ছিলেন। তাঁর জীবনী ছাপান তো আপনাদেরও কর্ত্তব্য?

অশোক চোখ চাহিয়া কহিল, আমাদের স্বদেশী কাগজ, সরকার পরিপুষ্ট জীবদের আমরা কৃতী সন্তান বলে স্বীকার করিনে; তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছাপাবো, তাইতো আমাদের অনুগ্রহ।

তাঁর সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা আমাদের কাগজে শোভা পায় না।

মিঃ চাটার্জ্জি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল সম্বন্ধে এহেন তাচ্ছিল্যের কথা উঠিতে পারে, মিঃ চ্যাটার্জ্জি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। যে-পদ পাইয়া তাহারা বার লাইব্রেরীতে নিজেদের ধন্য মনে করে, সে-পদের প্রতি স্বদেশী খবরের কাগজের অফিসে এতোটা ব্যঙ্গ!—একথা মিঃ চাটার্জ্জির কাছে অভূতপূর্ব্ব মনে হইল। জীবনের যোগ্যতা বিচার করিবার এতো বিভিন্ন মাপকাঠি থাকিতে পারে, মিঃ চ্যাটার্জ্জির তাহা জানা ছিল না। অবশ্য সে-সব কথা জানিবার জন্য তিনি কখন চেষ্টাও করেন নাই। তিনি জানেন যে, জীবনে দুই মুঠা ভরিয়া যিনি অর্থ আনিতে পারেন, তিনিই কৃতী, তাঁহারই মহিমা আখ্যাত হইবে দেশে দেশে এবং প্রখ্যাত হইবে খবরের কাগজে।

মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, আপনাদের রাজনীতি যাই হোক, খবরের কাগজের সাধারণ কর্ত্তব্য তো আপনারা পালন করবেন? হাইকোর্ট বারের যিনি নেতা, তাঁর মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে জীবনী আলোচনা করাও তো আপনাদের কাজ?

অশোক কৌতুক অনুভব করিল। সে সহজসুরে বলিল, দেশসেবার মঙ্গলকাজের ভিতর আমরা যাদের পরিচয় পাইনি, তাদেরকে আমরা অস্বীকার করি। আমরা উচ্চস্তরের লোক চাইনে, কারণ স্তর-বিন্যাসকে ধ্বংস করাই আমাদের কাজ।

আপনারা সমস্ত অধিকার করে আছেন বলেই তো আমরা বঞ্চিত। আপনাদের কোন স্থায্য দাবী আছে, একথা আমরা স্বীকার করিনে।

মিঃ চাটার্জ্জি হতাশভাবে বলিলেন, আপনারা মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেও রাজনীতি ভুলতে পারেন না?

অশোক হাসিয়া বলিল, আমরা বিগতের জন্য অনুশোচনা করিনে—অনাগতের জন্য আমাদের প্রস্তুতির প্রয়োজন।

মিঃ চাটার্জ্জি ব্যথিত হইলেন। শুধু বলিলেন, দেখছি, আপনারা কম্যুনিষ্ট!

মিঃ চাটার্জ্জি নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেলেন। অশোক খুসী হইল। আবার তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল যে, সকালের কাগজে তাহারই রচিত এ্যাডভোকেট জেনারেলের জীবনী প্রকাশিত হইবে। একবার মনে হইল যে, সে তাহার লেখাটা ফেলিয়া দেয়—আবার ভাবিল যে, তখন ফেলিয়া দিবার আর কোন উপায় নাই। ভোরের দিকে টেলিগ্রামের পাতায় অতখানি স্থান সে কি করিয়া পূরণ করিবে? অশোক ভাবিল যে, জীবনী প্রকাশিত হইলে সে মিঃ চাটার্জ্জির কাছে ছোট হইয়া যাইবে। হয়তো, তাঁহারা আত্মীয়-মহলে অশোকের সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করিবেন। অশোক ভাবিয়া ব্যথা পাইল, ছোট হইবে বলিয়া লজ্জা অনুভব করিল। কম্যুনিষ্ট অশোক এ্যারিষ্টক্রেটিক্ মহলের বিদ্রূপ-বন্যার ঢেউয়ের আশঙ্কায় যেন দুলিয়া উঠিল। রাজনীতির ফাঁকা কথাগুলি তাহাকে বিঁধিতে লাগিল।

অশোক শিশিরকে বলিল, নতুন টেলিগ্রাম এলে "লেটেষ্ট নিউজ" বলে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি নীচে প্রেসে যাচ্ছি টেলিগ্রাম পেজের "মেক্-আপ্" দেখতে।

শিশির ক্লান্তস্বরে বলিল, তুমি নীচে যাও, আমি টেবিলের ওপর শোবার বন্দোবস্ত করছি। টেলিগ্রাম এলে দিনের "ডাক-এডিশনে" যাবে। কোল-ষ্ট্রাইক্ আর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে টেলিগ্রাম-পেজে স্থান থাকবে না।

অশোক তাড়াতাড়ি প্রেসে নাবিয়া গেলো। তখন রাত্রির সাড়ে তিনটার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নীচে প্রেসের কোলাহল আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

দুই

টেবিলের উপর খবরের কাগজ পাতিয়া এবং খবরের কাগজ গায়ে মুড়ি দিয়া অশোক ঘুমাইতেছিল। যাহাদের জীবন-পথ কাঁকড়ে আকীর্ণ, ভগবান তাহাদের চোখে এতো ঘুম না দিলে বোধহয়.তাহারা পাগল হইয়া যাইত। সাড়ে দশটার সময় দিনের বেলার খগেন আসিয়া অশোককে জাগাইয়া দিল। অশোক জাগিয়া বেলা হইয়াছে দেখিয়া কোন লজ্জা অনুভব করিল না। শুধু বলিল, এতো সঠিক সময়েই যদি অফিস যাবে, তাহ'লে সরকারী অফিসে চাকরী নিলেইতো পারতে।

খগেন হাসিয়া বলিল, তোমার কি বিশ্বাস যে সরকারী কাজ পেলে স্বদেশী কাগজের অফিসে দেশ-সেবা করতে আসতুম?

অশোক প্রত্যুত্তর দিল, স্বরাজ পেলেই তো আমাদের কাগজ গবর্ণমেন্টের কাগজ হয়ে যাবে। আমাদের কাগজের মালিকরাই তো দেশের নেতা!

খগেন অবিশ্বাসের হাসিতে বলিল, তখন তোমার-আমার

ডাক পড়বে না ভাই। তাদের আত্মীয়-বান্ধবের তো অভাব নেই।

অশোক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, এই আত্মীয়-প্রথা ধ্বংস করতে হবে, খগেন। তা না হলে এই আত্মীয়-ব্যূহ ভেদ করে আমরা কোনদিনই স্থান করে নিতে পারবো না। এতো বড় সংসারে আত্মীয়-বান্ধবহীন যুবকের স্থান হ'বে না, সেই কথাটাই বা আমরা মানবো কেন?

খগেন বলিল, এতো উত্তেজিত হচ্ছিস্ কেন, অশোক? স্বরাজ এলে তো সে সমস্যা আসবে। আর, স্বরাজ আসবার আগে নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারবো।

অশোক দৃঢ় ভাবে বলিল, ভুল, খগেন, ভুল। তখন পথের ধূলি আর কোলাহলই আমাদের ভাগ্যে জুটবে।

খগেন চৌকিতে বসিয়া বলিল, পথের ধূলিকে উপেক্ষা করে আমি এগিয়ে যেতে অভ্যস্ত কিন্তু আপাততঃ এই টেলিগ্রামের স্তূপ আমাকে পরিষ্কার করতে হ'বে—তা না হলে ডাক্ এডিশনে কোন সংবাদই যাবে না।

অশোক বলিল, তোমার মফঃস্বল-লোকদের একটা সংবাদ দিলেই বা কি হয়, না দিলেই বা কি হয়! তা' তো আর কাগজের মালিকরা দেখতে আসবেন না। আর, সংবাদপত্রের কাজ যে সংবাদ সরবরাহ করা, এ বিশ্বাস তাদের নেই। নেতাদের বিবৃতি আর তাদের কংগ্রেসকর্ম্মীদের সংবাদ দিয়ে ভরে দাও, কোন অভিযোগই আসবে না।

খগেন মৃদু হাসিল।

অশোকের সমস্ত মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে একটা সিগারেট জ্বালাইয়া এবং খগেনের কাগজের উপর একটা সিগারেট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার হঠাৎ মনে হইল যে, 'ভাগীরথী' মাসিক কাগজের অফিসে গিয়া তাহার ছোট গল্পের বিনিময়ে অন্ততঃ দশটা টাকা লইয়া আসিতে হইবে। এই দশ টাকার ভিতর পাঁচ টাকা ধার শোধ করিতে হইবে এবং অন্ততঃ তিন টাকা শোভনাকে দিতে হইবে। শোভনা কি ভাবে সংসার চালায়, অশোক তাহা জানে না—কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেও তার সাহস হয় না, পাছে হিসাব চাহিলে বেশী টাকার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন হইলেই যে অশোকের মিটাইবার সাধ্য নাই—সেই কথা অশোক জানে, বোধ হয় শোভনা আরও ভালো করিয়াই জানে। শোভনা টাকা চায় বটে, কিন্তু তার চাহিদার মাত্রা যে খুবই স্বল্প, তাহা অশোক শোভনার কাছে না মানিলেও অন্তরে স্বীকার করে।

'ভাগীরথী' অফিসে গিয়া অশোক শুনিল যে, সম্পাদক মহাশয় তখনও আসেন নাই কিন্তু প্রোপ্রাইটার ঘরে আছেন। প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে তাহার পরিচয় শুধু চোখের দেখা। প্রয়োজন যখন মাথা উঁচু করিয়া দেখা দেয়, তখন স্বল্প পরিচয় জনিত স্বাভাবিক সঙ্কোচ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। অশোক প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিল।

অশোক ঘরে প্রবেশ করিয়া নমস্কার দিয়া সরাসরি ভাবে বলিল, আমি একটা গল্প এনেছিলাম।

প্রোপ্রাইটার প্রতি নমস্কার জানাইয়া বলিলেন, বসুন। তারপর মুখের এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, সাহিত্যে সম্বন্ধে তাঁহারও যে দখল আছে এবং সব সময় তিনি সম্পাদকের উপর নির্ভর করেন না, তাহাই যেন তিনি বলিতে চান।

তিনি গল্পের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন—গল্প আপনারা এতো বড় ক'রে লেখেন কেন? আমি চাই ছোট গল্প—যেমন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প। তাহলে কাগজের পাতার সংখ্যা না বাড়িয়ে গল্পের সংখ্যা বাড়ানো যায়।

অশোক বুঝিল যে, মূর্খরা যখন বিজ্ঞতার ভাণ করে, তখন এরকম কথাই বলিয়া থাকে। অশোক শুনিয়াছিল যে, প্রোপ্রাইটার মহাশয় লেখার জন্য টাকা দেন কিন্তু অনেক হিসাব-নিকাশের এবং বহু স্তোকবাক্যে ভূষিত হইবার পরে। অশোকের রুচিতে তাহা বাধে এবং অযথা প্রশংসা-বাক্যে লোকের মন ভুলাইবার কৌশল আয়ত্ত করে নাই বলিয়া জীবন-পথে অনেক আঘাত সে পাইয়াছে।

অশোক তবু বলিল, সংখ্যা বাড়াতে গেলে বেশী দামও দিতে হয়।

প্রোপ্রাইটার মহাশয় হঠাৎ থামিয়া গিয়া অশোকের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, দাম! দাম দিয়েতো আমি গল্প নিইনে। সম্পাদক মশায় আমাকে বলছিলেন বটে যে, দরিদ্র সাহিত্যিক-

দের কিছু মূল্য দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা তো এতো গল্প পেয়েছি যে কোন মূল্যই দিতে হয় নি।

অশোক বিষণ্ণ মনে বলিল, তাহলে আমার গল্পটা ফিরিয়ে দিন। বিনা পারিশ্রমিকে নিজের পরিশ্রমকে বিলিয়ে দেবার মত এতোটা ঐশ্বর্য্য আমার নেই। আমরা দরিদ্র সাহিত্যিক নই—আমাদের পরিশ্রমের যথাযোগ্য মূল্য পাইনে বলেই আমরা দরিদ্র।

কথাটার ইঙ্গিত প্রোপ্রাইটার মহাশয় বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করিলেন না। মোটামুটি তিনি এই কথাটা বুঝিলেন যে, বিনা মূল্যে গল্প পাওয়া যাইবে না। অথচ এতো সহজে মূল্য দিলে তাহার নিজের পরাজয় হইবে—এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রোপ্রাইটার মহাশয় গল্পটা ফিরাইয়া দিলেন।

যখন সত্যসত্যই অশোক চলিয়া গেল, তখন প্রোপ্রাইটার ভাবিলেন যে, বোধ হয় গল্পটা ভালই ছিল, মূল্য দিয়া রাখিলেও নিজের অজ্ঞতা প্রমাণিত হইত না। এই রকম ব্যবহার সাধারণতঃ তিনি লেখক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পান না বলিয়াই প্রথমটা তিনি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। যখন ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন, তখন অশোক অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

অশোক 'প্রভাতী' অফিসে গেল। সম্পাদক গল্প ছাপাইতে রাজী হইলেন—মূল্য দিতেও স্বীকৃত হইলেন কিন্তু

লেখা ছাপা হইবার পূর্ব্বে তাহাদের মূল্য দিবার প্রথা নাই। যাহারা প্রথা মানিয়া চলিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের কাছে প্রয়োজনের দোহাই দিয়া লাভ নাই। অশোক পারিশ্রমিক না পাইলে গল্প দিতে অক্ষম, শুধু এই কথাটা জানাইয়া চলিয়া গেল।

অশোক "বাঁশরী" কাগজের কাছেও প্রত্যাখ্যাত হইল। এই বিশ্বের হাটে নগদ মূল্যে কেহ কিছুই কিনিতে চাহে না। বাকি কিনিবার স্বাদ যাহারা পাইয়াছে, নগদ বেচা-কেনার উপকারিতা তাহারা অস্বীকার করে। অশোক বুঝিল যে, বাজারের চাহিদার অনুপাতে মাল বেশী আমদানী হইলে মালের গুণ বিচারের সুযোগ ও প্রয়োজন কমিয়া যায়। লেখক সম্প্রদায় তাহাদের মাল ধরিয়া রাখিতে পারে না বলিয়াই বাজারে তাহাদের মূল্য বাড়ে না। তাহারা যদি কিছুদিন তাহাদের মাল না ছাড়িয়া ধরিয়া রাখিতে পারে, তাহাদের মালের চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং মালের গুণানুসারে দাম পায়। এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া লেখার "মার্কেটিং" অর্থাৎ চাহিদা অনুসারে বাজারে লেখা ছাড়িতে পারিলে, কাগজের সম্পাদকদের ও মালিকদের শোষণ-নীতি বন্ধ করা যায়। তাহাদের লেখার দাম ওঠেনা বলিয়াই ভাল লেখার আমদানী হয় না। অশোক আজ সহজেই বুঝিল যে, জগতে এই ভাবে সব স্রষ্টা ও উৎপাদনকারীরা ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে এবং ক্রেতারাও খারাপ মাল পাইয়া ঠকিতেছে—

শুধু লাভের সমস্ত অংশটাই এই মাঝের ব্যবসায়ী পাইতেছে। এই লোভী ব্যবসায়ীদের হাত হইতে উদ্ধা[illegible]ইতে হইলে যাহারা স্রষ্টা, যাহারা সত্যিকারের উৎপাদ[illegible]রী, তাহাদের সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। এই বিরাট কা[illegible]ক্রেতাদের সহ-যোগীতা প্রয়োজন—কারণ ক্রেতাদের ক্ষতিও [illegible] কম নয়।

কিন্তু অর্থনীতিতে যে কথাই বলুক, [illegible] আজ লেখা বিক্রী করিয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে। প্রয়ো[illegible]নর আগুন যখন জ্বলিয়া ওঠে, অপেক্ষা করিতে গেলে সে[illegible]স্ত পুড়িয়া ছারখার করিয়া দেয়। ক্লীবের মত দাঁড়াইয়া [illegible] দাহন দেখিতে পারে না—হয় সে আগুন নিবাইবে, ন[illegible] নিজে জ্বলিয়া শূন্যবোমে বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু সে [illegible]ক্তহীন, এই বিরাট ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একা সে কি করিবে?

তবুও উপায় নাই। অদৃষ্টের ক্রুর পরিহা[illegible] নিয়তির অন্যায় বিধান, ভাগ্যনিয়ন্তার নির্ম্মম অভিলাষ—স[illegible]রই উর্দ্ধে উঠিয়া তাহাকে ভাসিয়া থাকিতে হইবে।

অশোকের মনে পড়িল যে নতুন সাপ্তাহিক "ফাল্গুনী" কাগজে তাহার বন্ধু সত্যসুন্দর মজুমদার সম্পাদক হইয়াছে। তাহার কাছে একটা লেখা সে চাহিয়াছিল। নতুন কাগজ, কোন আদর্শ নাই, কোন বক্তব্য নাই, শুধু সখে তাহারা কাগজ বাহির করিয়াছে, তাই লেখা পাঠাইতে সে কোন উৎসাহ পায় নাই। অশোক ভাবিল, নতুন কাগজ, সম্ভবতঃ হাতে এখনও পয়সা আছে। হয়তো, তাহার লেখা ভাল পাঠকের

হাতে পড়িবে না। হয়তো, তাহার লেখার কদর হইবে না। কিন্তু প্রয়োজন তাহার অর্থের, লেখার আদর নয়। সে "ফাল্গুনী" অফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

সত্যসুন্দর অশোককে দেখিয়া অবাক হইল। বলিল, পথ ভুল করে এলে, অশোক ?

অশোক বলিল, পথ ভুল করে আর তোমার কাছে আসবো কেন ? তোমরা যে চেনা-পথের লোক।

অশোক কোন ভূমিকা না করিয়া জানাইয়া দিল যে, সে একটা ছোট গল্প দিতে পারে যদি নগদ মূল্য কিছু পায়। সত্যসুন্দর লোভে কাঁপিয়া উঠিল—ভাবিল যে, অশোককে হাতে রাখিতে পারিলে "ক্যালকাটা ক্রনিকল" কাগজে তাহাদের "ফাল্গুনী"র প্রশংসাসূচক সমালোচনা ছাপান সহজ হইবে। তরুণ সাহিত্য সমালোচনায় অশোকের বিশেষ খ্যাতি আছে—অতএব তাহাকে খুসী রাখিতে পারিলে তাহাদের লিখিত পুস্তকাবলীর প্রশংসা বাহির করিতে অসুবিধা হইবে না।

সত্যসুন্দর হাসিয়া বলিল, তোমার রচনা পাওয়া তো 'ফাল্গুনী'র সৌভাগ্য। তোমার লেখা এমন সাজিয়ে ছাপাবো যে দেখবে সাহিত্যিকমহলে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে।

অশোক কোন উল্লাসের ভাব দেখাইল না। সে শুধু বলিল, তুমি যেমন খুসী ছাপিয়ো—কিন্তু আমাকে লেখার মূল্য হিসাবে দশটি টাকা দিতে হবে।

সত্যসুন্দর একটু ভাবিয়া বলিল, দশটাকা কেন, আমি তোমাকে পনর টাকা দিতে পারতাম। কিন্তু যার অর্থের উপর নির্ভর করে আমরা কাগজ বের করেছি, তিনি চলে গেছেন পুরীতে। টাকা পাঠাতে দেরী করছেন, তাই অসুবিধে হচ্ছে।

অশোকের হাসি-ভরা চোখ ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল, কিন্তু টাকার যে ভাই আমার খুব প্রয়োজন।

সত্যসুন্দর বলিল, বেশ, পাঁচ টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও।

অশোক চুপ করিয়া রহিল। সত্যসুন্দর বুঝিল যে, অশোক তাহাতে রাজী নয়। অথচ অশোককে অসন্তুষ্ট করিবার সাহস বা ইচ্ছা তাহার নাই। অনেক কথা কাটাকাটির পর অশোককে সাড়ে-সাত টাকা নিতে সম্মত করাইল।

অশোক ম্লান হাসি হাসিয়া বিদায় লইল। সত্যসুন্দর চা খাইতে অনুরোধ জানাইল। কিন্তু অশোক তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না।

অশোক যখন বাসায় ফিরিল তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। শোভনা একাকী থাকে—স্বামীর সঙ্গ পায় না বলিয়া সে একাকী, আবার স্বামীকে অন্তরে পায় না বলিয়াও সে জীবন পথে একাকী। স্বামীর বিলম্বে বাড়ী ফেরাতে শোভনা এখন আর কোন উৎকণ্ঠা অনুভব করে না। উৎকণ্ঠা অনুভব করিয়া, চোখের জল ফেলিয়া, নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য ব্যথিত

হইয়া, আবেদন জানাইয়া দেখিয়াছে যে, অশোকের জীবনে কোন নিয়মানুবর্ত্তিতা নাই। অশোক-কে মিনতি জানাইলে সে হাসিয়া বলিতো যে, যাহাদের কাজের সময় সাধারণ নিয়মের বাইরে, তাহারা সময়ের দাস হইয়া থাকিতে পারে না। চওড়া রাজসড়কে যাহাদের আনাগোনা, তাহারা পথের নিয়ম মানিয়া চলিবে। কিন্তু যাহারা অন্ধ গলিতে ঘুরিয়া মরিতেছে, তাহাদের বিশ্রামের নিয়ম আলাদা, চলাফেরার আইন-কানুন সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

শোভনা একখানা গল্পের বই পড়িতেছিল। অশোককে দেখিতে পাইয়া সে উঠিয়া বসিল। ক্লান্তমুখ দেখিয়া শোভনার অন্তর ব্যথার সুরে ধ্বনিয়া উঠিল। তাই সে কোন কথাই বলিল না।

অশোক খাওয়া শেষ করিয়া শুইয়া পড়িল—শোভনাকে ইঙ্গিত করিল তাহার পাশে আসিতে। জীবনে যখনই সে কোন আঘাত পায়, তখনই তাহার শোভনার কথা মনে পড়ে। শোভনাকে সে ভালবাসে, কিন্তু সে জীবনের ঘোড়দৌড়ে পরাজিত বলিয়া তাহার ভালবাসার স্রোতস্বিনী যেন নিজের পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই অশোকের অন্তরের কলগীত শোভনাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না। অশোক ও শোভনা যেন একই নদীর দুই বিভিন্ন পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। যদিও একই গণ্ডীর মধ্যে তাহারা বহিয়া চলিতেছে, তবুও যেন মনে হয় তাহাদের গতির লক্ষ্য বিভিন্ন দিকে। অশোকের

জীবনপ্রবাহে উচ্ছলতা, দূরের তরঙ্গ তাহাকে আকর্ষণ করে বেশী। বাধা যতই সে পায়, তরঙ্গের ফেনিলোচ্ছ্বাস দেখিয়া ততোই সে নাচিয়া উঠে। হয়তো, সমুদ্রের অতল জলে সে মিশিয়া যাইবে, তাহার কোন চিহ্নই থাকিবে না, তখন পথ-হারা প্রবাহ খান্ খান্ হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে, নিজের সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ হইবে। ভীষণ পরিণামের আশঙ্কা তাহাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তোলে। সংসারের শান্তিপ্রিয় অভিজ্ঞ লোক এই উত্তাল তরঙ্গের আকর্ষণকে অপ্রশংসার চোখে দেখিয়া থাকেন। শোভনার জীবনপ্রবাহে যেন নিজের গতি নাই—সে যেন মিলিত হইয়া বিলীন হইয়া যাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়—নতুবা কোন মরুপথে সে নিজের গতি হারাইবে, সে জানে না। এই মরুপথগামী গতিকে অশোক সহিতে পারে না। তাই শোভনার দিকে সে নিজেকে ধাবিত করিতে পারে না।

অশোক নিজের জীবনে অবিচারে পীড়িত বলিয়া কাহারও প্রতি অবিচার করিতে চাহে না। শোভনার প্রতি অবিচার করিবার এককণাও তাহার অভিলাষ নাই। কিন্তু শোভনার গ্রন্থি যেন আলগা হইয়া যায়—শোভনা অশোককে টানিয়া আনিতে চায় না। যাহারা টানে না, যাহাদের টানিয়া আনিবার শক্তি নাই, তাহাদের জীবন-সঙ্গী কত নিঃস্ব, অশোক মাঝে মাঝে তাহা ভাবিয়া আঁতকাইয়া উঠে। অশোক জানে যে, টানা-টানিতে জীবন-পথের সহজ গতি পদে পদে বাধা পায়, কিন্তু পথে পথে যাহারা একই তালে চলিবার জন্য ছন্দোবদ্ধ,

তাঁহারা পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া না রাখিলে সমস্ত 'সিম্ফনি' নষ্ট হইয়া যায়। সুরের আকর্ষণী শক্তি তখনই বাড়ে যখন সে আপন গণ্ডীর ভিতর নানাভাবে খেলিয়া বেড়ায়। অশোকের মতে, নারীর এই খেলিয়া বেড়াইবার শক্তি না থাকিলে পুরুষকে আকর্ষণ করিতে পারে না। একই নিখাদে যদি সুর বাজিতে থাকে, তাহা হইলে তাহা অসহনীয় হইয়া উঠে। শোভনা যেন অশোকের কাছে সেই একই নিখাদে বাজা সুর।

শোভনাকে অশোক আদর করিয়া পাশে টানিয়া আনিয়া বলিল, শোভনা, তুমি গরীব স্বামী পেয়েছ বলে তোমার দুঃখ? তোমার বাবাতো চেষ্টা করলে অর্থবান জামাতা আনতে পারতেন। তাহলে দুঃস্থ গৃহস্থের বউ হয়ে তোমাকে এত কষ্ট পেতে হ'তো না।

শোভনার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। অশোকের আদরে তাঁহার মনটা আর্দ্র হইয়াছিল, অশোকের কথার আঘাতে তাহার অন্তর ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। কিন্তু আজকাল সহজে সে চোখের জল ফেলে না—ফেলিয়া দেখিয়াছে যে, চোখের জল তাহাতে কমে না। যে সহ্য করিতে না শিখিল, সে ঠকিল।

শোভনা ভারী কণ্ঠে কহিল, আমি কোনদিন সেই নালিশ তোমায় জানায়নি। বাবা আমাকে কি এবং কোথায় দিতে পারতেন, জানিনা। কিন্তু যাকে আমি পেয়েছি এবং যেখানে আমি এসেছি, তাকে প্রণামের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। দারিদ্র্যকে

সহ্য করে আপন করে নিয়েছি। সেই কারণে তোমায় যেন কোন কটু কথা না বলি, এই আশীর্ব্বাদই করো।

অশোক ব্যথা অনুভব করিল। সে বলিল, তুমি যে কিছু বলো না, মুখ বুজে সবই সহ্য করো—আমার মনে হয়, সেটা তোমার তাচ্ছিল্য, আমার পৌরুষের প্রতি তোমার অনুকম্পা। আমি সহ্য করি উপায় নেই, কিন্তু তার জন্য অভিযোগ করবো না, একথা ভাবতেই পারিনা। তাই তোমার কণ্ঠে অভিযোগের সুর পাইনে বলে মনে হয় তুমি আমাকে অভিযোগের যোগ্যও মনে করো না।

শোভনা তাহার ডাগর চোখ দিয়া স্বামীর দিকে একবার তাকাইল। সহানুভূতির সুরে সে বলিল, তুমি জানো বেশী, বোঝ বেশী, তাই বোধ হয় ব্যথাও পাও বেশী। আমি জানি কম, বুঝিও অল্প, তাই আমি সব মেনে নিই। অভিযোগের শলাকা দিকে জীবন-ভাণ্ডকে নেড়ে দিতে আমাদের সাহস হয় না। তাতে বিপদ আছে, স্বীকার করো?

অশোক স্বীকার করিয়া বলিল, তোমরা এতো সহজে তোমাদের পরাজয় মেনে নাও যে, জানিনা ভগবান তোমাদের কি সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু পরাজয়কে যারা মেনে নেয়, জয়ের পথের সন্ধান তারা দিতে পারে না।

শোভনা শুধু বলিল, হয়তো তা-ই।

অশোকের মনে হইল যে, বাঙ্গালী মেয়েদের এই যে মুখ বুজিয়া সহ্য করিবার শিক্ষা ও স্বভাব, তাহা পুরুষের

জীবনকে অসাড় করিয়া দেয়। জীবনকে যাহারা ত্যাগের চোখে দেখিয়া থাকে, সংসারকে যাহারা মায়া ও মোহের আকর বলিয়া ভাবে, এই বিশ্বের ভোগক্ষেত্রে তাহারা কোণ-ঠাসা হইয়া থাকে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই ত্যাগের প্রতি পক্ষ-পাতিত্বকে অশোক প্রশংসা করিতে পারিল না।

অশোকের নীরবতা শোভনার ভাল লাগিল না। এই দ্বিপ্রহরের আলাপকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য শোভনা বলিল, চল না, শ্যামবাজারে যাই। বহুদিন বাবা-মাকে দেখা হয় নি।

কিন্তু শোভনার কথা বেসুরা খাদে পড়িল। অশোক শ্বশুর-বাড়ী যায় না। তাহার ইচ্ছা যে, শোভনাও না যায়। অশোকের শ্বশুর মহাশয় অর্থবান লোক। লগ্নী কারবার করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীর অন্দরে আধুনিক শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিতে পারে নাই—শুধু শোভনা তাহার দাদা বিমানের চেষ্টায় প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। শোভনা কলেজে পড়ে নাই—পড়িবার উপায় ছিল না বলিয়া। বাড়ীতে বসিয়া যতটা শিক্ষা করা যায় শোভনা তাহা করিয়াছে।

শোভনার পিতা হরসুন্দর বাবু পাকা সাংসারিক ও প্রাচীন পন্থী। হরসুন্দর বাবুর একমাত্র পুত্র বিমান এবং দুই কন্যা, শোভনা ও ময়না। ময়না এখন স্কুলে পড়ে। হরসুন্দর বাবুর পাটের ও কাঠের ব্যবসা আছে—বিমান তাহাই দেখে। হরসুন্দর বাবু গঙ্গাস্নানে ও পূজা আহ্নিকে সময় কাটাইয়া

দেন। হরসুন্দরবাবুর স্ত্রী বাতের ব্যথায় প্রায়ই শুইয়া থাকেন। বিমানের স্ত্রী কুসুমবালা সংসারের কাজের দিকটা দেখেন।

শ্বশুর বাড়ীতে একটা সহজ প্রাচীনতা ঘেরিয়া আছে বলিয়া অশোক সেখানে গিয়া আনন্দ পায় না। অশোক বিদ্বান ছেলে বলিয়া তাহারা শোভনাকে বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু অশোককে পাইয়া তাহারাও সুখী হয় নাই। তাহারা ভাবে যে, অশোক ইচ্ছা করিয়া ভাল চাকুরী গ্রহণ করে না, নিজের আলস্যে দারিদ্র্যকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। এতো লেখাপড়া শিখিয়া যদি অর্থই রোজগার না করিল, তাহা হইলে লেখাপড়া শিখিবার কিছুই অর্থ হয় না। খবরের কাগজের অফিসে চাকুরী করাকে তাহারা চাকুরী ভাবে না। যে চাকুরীতে "গ্রেড" নাই, বোনাস নাই, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নাই—বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে মাহিনা অগ্রিম পাওয়া যাইবে না, তাহাকে তাহারা চাকুরী ভাবিতে পারে না, ভাবেও না।

বিমান শোভনাকে ভালবাসে। সে প্রায়ই শোভনার খোঁজ নেয় এবং মাঝে মাঝে তাহাদের শ্যামবাজারের বাড়ীতে লইয়া যায়। বিমান শোভনাকে গোপনে টাকা দিয়া সাহায্য করে এবং তাহা এতোই গোপনে যে দাতা ও গ্রহীতা ব্যতীত আর কেহই জানে না। বিমান ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া পিতার ব্যবসা দেখিতেছে, তাই অশোকের সঙ্গে কথা বলিতে ভয়ও পায় এবং তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে যাইতে বেশী

যোগ্যব্যক্তিকে অধিকারচ্যুত করিবার উপায়গুলি অবলম্বন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। অশোক শোভনাকে বুঝাইয়া দিতে পারে যে, তাহাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সকলেই সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং সমান অবস্থায় প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় না। তাই ঘোড়দৌড়ে যাহারা জিতিয়া যায়, তাহাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। শুধু এইসব কথা বিশদ্‌ভাবে বুঝাইতে অশোকের একটু বাধিল কারণ সে নিজে বঞ্চিতের দলে, নিজে সমাজের ও রাষ্ট্রের "হাণ্ডিকেপের" ভারে অবনত হইয়া প্রতি-যোগিতার দৌড়ে থুবড়াইয়া পড়িতেছে। নিজের স্ত্রীর কাছে নিজের অপমানিত পৌরুষের পক্ষে যুক্তি আওড়াইতে তাহার রুচিতে বাধিল। কিন্তু একথাও সে জানে যে একই অবস্থায় পড়িলে সে কাহারও নীচে থাকিত না। অথচ, আজ তাহার শক্তি শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় অপমানিত।

অশোক শোভনার দিকে চোখ চাহিয়া কহিল, তোমাদের শক্তিমান কৃতী পুরুষদের নমস্কার জানাচ্ছি। কিন্তু ওঁদের শক্তির ভাণ্ড কোথায়, তার সংবাদ তোমরা রাখলে না। ওঁরা যদি নিজেদের শক্তিতে জয়ী হ'তো, ওঁদের আঙিনায় আমিই গিয়ে কাঁশরঘণ্টা বাজাতেম। কিন্তু ওঁরা পিপে, ভিতরে কিছু নেই বলেই ভেসে আছেন।

শোভনা বুঝিল যে স্বামীকে আর উত্তেজিত করাইয়া লাভ নাই। সংসারে যাহারা পরাজিত, পরাজয়ের কথা তাহাদের কাছে সবচেয়ে বিস্বাদ লাগে।

৩

শোভনা আর একবার অনুরোধ করিয়া বলিল, চল না, শ্যামবাজারে একবার যাই।

শোভনা অনেকদিন যাবৎ তাহার ছোট ভগ্নী ময়নাকে দেখে নাই। তাহার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দাদার কাছে শুনিয়াছিল যে ময়না লেখা-পড়া অবহেলা করিতেছে। তাহাকে পড়া-শুনায় মন দিয়া আসিতে বলিতে হইবে। শোভনার বিশ্বাস যে শিক্ষার যত ত্রুটিই থাকুক, তাহা অশিক্ষার চেয়ে শতগুণে ভাল। কিন্তু যাঁহারা কুশিক্ষার ভয়ে শিক্ষার বিরুদ্ধতা করেন, শোভনার পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন। এমন কি, লেখা-পড়ার প্রতি ময়নার অবহেলা দেখিয়া হরসুন্দর বাবু খুসীই হইয়া থাকেন।

অশোক কোন কথাই বলিল না, ভাবিতে লাগিল যে তাহার পকেটে সাড়ে-সাত টাকা আছে। ইচ্ছা করিলে ধার শোধ না দিয়া সে শোভনাকে লইয়া শ্যামবাজারে যাইতে পারে, অথবা সিনেমায় যাইতে পারে, কিন্তু সেই টাকার কথা সে শোভনার কাছে বলিতে সাহস করিল না। এক নিজের ভাবিয়া সে তাহা খরচও করিতে চাহিল না। শুধু ভয় হইল পাছে শোভনা তাহার কাছে টাকা চাহিয়া বসে: সকালে ফিরিয়া শোভনাকে টাকা দিবে বলিয়া অশোক আশ্বাস দিয়া গিয়াছিল,.শোভনা তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে কি-না, তাহা অশোক বুঝিল না। সভয়দৃষ্টিতে যেন অশোক শোভনার দিকে তাকাইল।

শোভনার মন মুষড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া শোভনা অশোককে টাকার কথা স্মরণ করাইয়া দিল না। অর্থাৎ নিজের জটিলতা স্বামীর কাছে টাকা চাহিয়া আর বাড়াইতে চাহিল না।

তক্তপোষ ছাড়িয়া শোভনা চা করিবার জন্য উঠিয়া গেল। অশোক কোন কথা না বলিয়া পাশ ফিরিল। দুপুরে ঘুম হইল না ভাবিয়া সে ক্লান্ত অনুভব করিল।

নীচের ফ্লাট হইতে ঝি'এর কর্কশ ও কলহপূর্ণ কণ্ঠস্বর অশোকের বিশ্রামকে আরও বাধা দিল।

তিন

প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ বেলায় অশোক মাধুরীদের বাড়ী চা খাইতে যায়। মাধুরী বি, এ পড়ে। মাধুরীর বাবা রায়বাহাদুর অলক দত্ত অশোককে খুব ভালবাসেন। তাহারা একই গ্রামের লোক, সহজ সীমা এড়াইয়া গেলে দুই পরিবারের ভিতর ক্ষীণ সম্পর্কও আবিষ্কার করা যায়। মাধুরীর মা অনিতা দেবী আত্মীয়মহলে অপ্রশংসিত হইলেও অশোককে ভালবাসিতেন। সংসারে এমন কতক লোক আছেন যাঁহারা আত্মীয়দের ভিতর প্রশংসা পান না—অথচ অনাত্মীয়মহলে আদৃত হন। তাহাদের সামাজিক মন ও গুণ আছে, অথচ পারিবারিক নির্লিপ্ততা নাই। দশজনের সঙ্গ পাইয়া তাঁহারা বিকশিত হন, কিন্তু পরিবারের প্রাচীরে আত্মীয়স্বজন বেষ্টিত অন্ধকারের গলিতে তাঁহারা পথ চলিতে পারেন না, ঠক্কর খাইতে খাইতে অগ্রসর হন এবং পারিপার্শ্বিক লোকজনকে আঘাত দেন। অনিতা দেবী তাঁদেরই একজন—গোষ্ঠীর আসরে তিনি গর্ব্বিনী বলিয়া আখ্যাত, অথচ যাঁহাদের সঙ্গে তিনি

মেলামেশা করেন, তাঁহারা অনিতা দেবীর ব্যবহারে বিমুগ্ধ। তাল ও মাত্রা থাকিলেই সঙ্গীত হয় না, অথচ আমরা মানুষের কাছ হইতে সুর ও তাল চাই, সঙ্গীত পাইবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া ওঠে না। সাধারণ দৃষ্টিতে অনিতা দেবীর চলা-ফেরায় অনুমোদিত সুর ও তাল নাই, অথচ তাহাতে সঙ্গীত আছে। যাঁহারা সঙ্গীত চান, অনিতা দেবী তাঁহাদের কাছে শ্রদ্ধা পান।

রায়বাহাদুর অলক দত্ত মুন্সেফ হইতে ডিষ্ট্রিক জজ্ হইয়াছিলেন, এখন অবসর প্রাপ্ত। তিনি বেশী বয়সে অল্প বয়সের ক'ণে গৃহে আনিয়াছিলেন, তাই অনিতা দেবী এখনও চল্লিশের কোঠা পার হন নাই। রায়বাহাদুর স্ত্রী-স্বাধীনতা পছন্দ না করিলেও নিজের স্ত্রীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। অনিতা দেবী রায়বাহাদুরের যেন লাখেরাজ সম্পত্তি, তিনি কোন খাজনা পান না কিন্তু তাহার জন্য রাজস্ব দিতে হয়। দীর্ঘকাল তাঁহার জীবন কাটিয়াছে পরের সম্পত্তির মামলা নিষ্পত্তি করিতে, তাই বোধহয় তাঁহার নিজের সম্পত্তির বিষয়ে খুব চেতনা নাই। তাঁর একমাত্র পুত্র বিজন, অর্থের সন্ধানে বর্ম্মায় গিয়াছে এবং একমাত্র মেয়ে মাধুরী, এই দুই জনের ভার অনিতা দেবীর উপর। ইহাদের সম্বন্ধে রায়বাহাদুর ভাববাচ্য, কারণ কর্ম্মপদে মাতা অধিষ্ঠাত্রী। রায়বাহাদুর এখন তাঁর একমাত্র রায়বাহাদুর উপাধির ভারে কাতর। অনিতা দেবীর "রায়বাহাদুরী" উপাধিতে মন ওঠে নাই। কিন্তু রায়বাহাদুরের সর্ব্বদা আশঙ্কা যে, কি করিয়া তিনি সেই উপাধির শ্রদ্ধা রাখিতে

পারিবেন। এই চিন্তাই তাঁহার মনকে পীড়া দেয়।

প্রতি শনিবার অশোকের আসিতে হয়, তাহার অজুহাত হইল মাধুরীকে "ইকনমিক্‌স্‌" পড়ানো। মাধুরী বলে, সে ইকনমিক্‌স্‌ কিছুই বোঝে না।

অশোক বুঝিয়ে দিতে সম্মত হয়। অশোক জানে যে তার জ্ঞানের পেয়ালা যতখানি সে উপুর করিয়া ঢালিয়া দিবে, ততখানি সে রসে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। সংসারে অনুর্ব্বর প্রয়োজনক্ষেত্রে অশোক কূপ খনন করিয়া চলিয়াছে, তাহা শস্য ফলিবার পূর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া উঠে। কূপগুলি শুধু খানার কাজ করে, তাহার তৃষিত কর্ম্মক্ষেত্রের কোন কাজেই লাগে না। রাজপথের ভিড়ের ঠেলায় অশোক তাহার মাল সঠিক স্থানে পৌঁছাইতে পারে না, তাই বিনা মুনাফায় নিজেকে উজার করিয়া দিতে হয়। অশোক সংসারের প্রয়োজনের হাটে মুনাফা পাইত না বলিয়া রসের হাটে সে সতর্ক থাকিত। মানুষের একটা রসের দিক আছে—সেখানে সংসারী, পাকা ও রাশভারী লোক আদৃত হয় না। রসের আসরে অশোক সত্যিকারের বীণকার ছিল, তাহার মৃদঙ্গে সুরতালব্যাপ্ত সঙ্গীত ছিল। মাধুরীর কাছে আসিয়া সে রসের কৌটা ভরিয়া নিত। রসের আসরেও জবরদস্তি চলে কিন্তু সেখানে স্থান হয় গুণীর। অশোক তাহার এই দ্বৈত সাধনায় নিজের স্থিতি যেন পাইয়াছে। বাস্তব-সংসারে যে রাজসড়কে চলিবার স্থানটুকুও পাইতেছিলনা, এখানে সে যেন থামিবার স্থানও পাইয়াছে। তাই

বাস্তবের মণ্ডপে ঢাকের কোলাহল সইতে না পারিয়া মাধুরীর পর্দ্দানসীন মন্দিরে সে সেবক। নারীর চারিদিকে আছে আবরণের মায়া ও গুণ্ঠনের মোহ—সেই বন্ধনজালকে যাহারা অপ্রশংসার চোখে দেখেন, অশোক তাঁহাদের দলভুক্ত নয়। যাহারা লোভী, তাহারা লালসার দংশনে নারীকে কুটি কুটি করিয়া ফেলিতে চায়। বন্ধনজাল ভেদ করিয়া প্রেমের আলো তাহাদের চিত্তে প্রতিভাত হয় না। অশোক সেই বন্ধনজাল ভেদ করিয়া আলোর ঝলমল দেখিতে চায়।

হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে মাধুরীদের বাড়ী। ট্রাম হইতে নামিয়া অনেকখানি পথ হাঁটিতে হয়—মনে হয় যেন, পায়ে-চলা পথিকের জনতাকে এড়াইবার জন্তই তাহারা এতোদূরে বাড়ী করিয়াছে। পথিকের বিরুদ্ধে মোটরবিহারীদের এই ষড়যন্ত্রে অশোকের বিরুদ্ধতা জাগিয়া ওঠে। মাধুরীকে মনে করিয়া থামিয়া যায়। ভাবে, এতো সহজে কোন বড় জিনিষ পাওয়া যায়না।

অশোক সেদিন যখন মাধুরীদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল অনিতা দেবী বাড়ীর সম্মুখস্থ লনে পায়চারি করিতেছেন। অশোককে দেখিয়া অনিতা দেবী বলিলেন, তোমাকে এতো ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?

অনিতা দেবী অশোককে স্নেহ করিতেন। অশোক অনিতা দেবীকে "মাসীমা" বলিয়া ডাকিত।

অশোক হাসিয়া বলিল, মাসীমা, তোমাদের বাড়ী আসতে

যে-কোন সবল লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতোটা পথ হাঁটতে হয়!

অনিতা দেবীর চোখ হাসিয়া উঠিল। তাহারই ইচ্ছায় এই পাড়ায় বাড়ী হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনের ঠেসা-ঠেসি তিনি সহিতে পারেন না। তাই তিনি এমন পাড়ায় বাড়ী করিয়াছেন যেখানে গরীব আত্মীয়দের আসিতে অন্ততঃ বেগ পাইতে হয়। অশোকের এতোটা পথ হাঁটিতে হয় বলিয়া তিনি ব্যথা পাইলেন, কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

অনিতা দেবী সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, আচ্ছা, এতোটা হেঁটেছ, তার পুরস্কার পাবে। তোমার মেসোমশায় ভাল কেক্‌ এনেছেন।

অশোক অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, রায়বাহাদুর তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী গিয়াছেন। অনিতা দেবীর শরীরটা খুব সুস্থ নাই বলিয়াই তিনি যাইতে পারেন নাই। তাহারা কথা বলিতে বলিতে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাধুরী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, অশোকদা আজ লেট্। আজ চায়ের সময় পার হয়ে গেছে।

অশোক গম্ভীর হইয়া বলিল, পড়ার সময়তো পার হয়নি।

অনিতা দেবী মাধুরীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অশোককে আজ কেক্‌ বেশী করে দিয়ো। অশোকের আজ ক্ষিদে পেয়েছে।

অনিতা দেবী অসুস্থ দেহ বহন করিয়া দোতালায় চলিয়া গেলেন। অশোক ও মাধুরী নীচের এক পাশের ঘরে গিয়া বসিল। টেবিলের সম্মুখে মাধুরীর কয়েকখানা কালেজের বই।

বেয়ারা আসিয়া অশোকের জন্য চা ও প্রচুর কেক্ দিয়া গেল। মাধুরী হাসিয়া ফেলিল। অশোক লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

মাধুরী একখানা বই নাড়িতে নাড়িতে বলিল, বউদিকে একদিন নিয়ে আসনা কেন? আমার খুব ইচ্ছে করে বউদির সঙ্গে আলাপ জমাতে।

যে-তন্ত্রীতে আঘাত করিলে অশোক মুখর হইয়া ওঠে, মাধুরী যেন সেই জায়গাতেই আঘাত করিল।

অশোক বলিল, তোমার কাছে আমি পথের ভিড় নিয়ে আসতে চাইনে। আমার পথ যে কুসুমাকীর্ণ নয়, সে কথাতো তুমি জানো।

মাধুরী ব্যথা পাইল। শুধু বলিল, বৌদিকে তুমি ভিড়ের অংশ-বিশেষ ভাব কেন? সে তো তোমার জীবন পথের সরাইখানা। সে দেবে তোমায় শান্তি, তার কোটাতে সন্ধান মিলবে তোমার কল্যাণ।

অশোক চা খাইতে খাইতে একবার মাধুরীর দিকে তাকাইল, তাহা যেন পথহারা পথিকের সত্রাস দৃষ্টি। অশোক দুঃখের সঙ্গে বলিল, জীবনের অন্ধগলিতে যারা ছিটকে এসে পড়েছে, তাদের জন্য পান্থশালা নেই। পথপ্রান্তে তাদের স্থান। তাই গৃহিণীর সঙ্গে আমাদের মিলনের সুযোগ স্বল্প। বিফলতার ধুলিতে যাদের দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে গেছে, নিকটের বস্তু তাদের কাছে ধরা পড়ে না। চোখ রগড়ালে জল বেরোয়, দৃষ্টি খোলে না।

মাধুরী ব্যথিত সুরে বলিল, নদীর এক পারের খবরই রাখো। প্রয়োজনের তরঙ্গে যারা ভেসে থাকতে পারে, তাদেরকেই তোমরা বাহাবা দেও। আমি মানুষকে একমাত্র মানদণ্ড দিয়ে বিচার করতে চাইনে। বিফলতাই তোমার সমস্ত পরিচয় নয়।

অশোক হাসিল। বুঝিল যে, মাধুরীর অভিজ্ঞতা কম। সে জানেনা যে, মানুষ ততখানিই সার্থক, যতখানি সে নিজের প্রয়োজনকে মিটাইতে পারিয়াছে। অর্থোপার্জ্জনের কৌশল যাহারা জানেনা, সংসারে তাহারাই কাঁচা ও অনভিজ্ঞ লোক। দুঃস্থতার ভারে যাহারা অবনত, অভাবের আঙিনায় যাহারা ঝুলি হাতে ধনীর দ্বারে প্রার্থী, তাহারা অনাদৃত ও মূল্যহীন। মানুষের বিচার চলে এই মূল্যের মানদণ্ডে। যাহারা মূল্য পাইলনা, তাহাদের এই সংসারে কোন কদর নাই। অশোক ভাবিল যে মাধুরী ধনীর কন্যা, অভিজ্ঞতার সুরমায় তার চোখ উজ্জ্বল হয় নাই, বিচক্ষণতার হাওয়া তার প্রাণকে এখনও স্পর্শ করে নাই, তাই সে বাস্তব মানুষকে বিচার করিতে শেখে নাই।

অশোক বলিল, মাধুরী, আঘাত যারা পেয়েছে, আঘাতের ব্যথা তারাই জানে। আজ আমি শক্তিহীন, তাই আমার কোন সম্বল নেই।

মাধুরী চুপ করিয়া রহিল। তাহার বলিবার কিছুই নাই। মাধুরীর কাছে অশোক অমূল্যনিধি—অথচ জগতের কাছে অশোক মূল্যহীন। ব্যক্তিবিশেষের ও সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টির ভিতর এতোটা অসামঞ্জস্য থাকে, তাহা ভাবিয়া মাধুরী বিস্মিত

হইল। অশোক জ্ঞানী ও গুণী, যাহার আসন উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত ছিল, তাহাদের কি-না জগৎসভায় ঠাঁই নাই। একথা মাধুরীর বিশ্বাস হইল না, সে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। মাধুরীর মনটা করুণায় ভরিয়া গেল; যে দ্বার দিয়া তাহার অন্তরের কন্দরে প্রবেশ করা যায়, তাহা যেন খুলিয়া গেল।

অশোক চঞ্চলভাবে বলিল, আজ আমি সম্বলহীন বলে তুমি আমাকে ঘৃণা করোনা। তুমি আমার জীবনের রজনীগন্ধা, এই অন্ধকারের দুর্গমপথে তুমি আমার সম্বল। তোমার সৌরভ তোমাকে দিবে পূর্ণতা, আমাকে দিবে শক্তি। আমার প্রভাত-রবিকে তুমি আমন্ত্রণ করে এনো, সেই আলোতে আমি পথের সন্ধান পাব।

মাধুরী সবকথার মর্ম্ম বুঝিল না—এইটুকু বুঝিল যে অশোক অসহায়, তাহাকে আজ সে সম্বলহীন অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারে না। অশোককে পথের সন্ধান সে দিতে পারিবে কি-না জানে না, কিন্তু যতদিন পথের সন্ধান না মিলিবে, সে যেন কিছুতেই সরিয়া যাইতে পারিবে না। এইভাবে নারী নিজের বন্ধনজাল বুনিয়া যায়, সার্থকতার সন্ধান দিতে না পারিলে নিজেরই জালে বাঁধা পড়ে। নারীর স্বভাব কৃপণ—সে যাহাকে পায়, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারেনা, নিজের কল্যাণের জন্যও নয়। তাই নারীর একদিক কল্যাণ, অন্যদিক অকল্যাণ—এ যেন এক পাড়ে পূর্ণিমা, অন্য পাড়ে অমাবস্যা।

অশোককে মাধুরীর ভাল লাগে—তাহাকে সে ভালবাসিয়াছে

কি-না জানে না। অশোকের শিল্পী-মন মাধুরীকে তৃপ্তি দেয়, তাই তার জীবনের ব্যর্থতা তাহাকে আঘাত দেয়। অশোক মাধুরীর জীবনে যতখানি স্থান করিয়া নিয়াছে, তাতে দাবী করা চলেনা। অথচ দাবী সে করিয়া বসিল। যে-নারীর চোখ ভাল লাগার অঞ্জনে আবৃত, তাহার দৃষ্টিকে ভালবাসার দিকে মোড় ফিরাইয়া দেওয়া খুব সুকঠিন নয়।

মাধুরী হতাশভাবে বলিল, অশোকদা, তোমার দুর্গম পথের অন্ধকারের জন্য আমার দীপশিখা তো যথেষ্ট নয়। আমার দীপের আলো হয়তো পথের ভীষণ রূপকে আরও প্রকাশ করে দেবে, তাকে বিদূরিত করবার জ্যোতি আমি কোথায় পাব?

অশোক হাসিয়া বলিল, তোমার আলোর তাপে আমি প্রজ্জ্বলিত হতে চাই, মাধুরী। আমি এগিয়ে যেতে চাই নিজেরই শক্তিতে—শুধু তোমার দীপশিখা আমার চিত্তে জলুক।

মাধুরী ডান চোখ বাঁকা করিয়া বলিল, আমি যদি পথ-হারা হই, আমি যে পথের অন্ধকারে অভিভূত হয়ে পড়বো।

অশোক আশ্বাসের সুরে বলিল, যারা দীপ জ্বালাতে জানে, তাদের কি অন্ধকার সইতে হয়? তাদের জীবনে তো দীপালি-উৎসব।

মাধুরী বুঝিল না যে, সে দীপ জ্বালাইতে জানে কি-না। কিন্তু সেই শক্তি যদি সত্যিই তাহার থাকে, অন্ধকার হইতে আলোর পথের সন্ধান সে তাহাকে দিবে, অন্ততঃ দিতে চেষ্টা করিবে। ব্যর্থ জীবনের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু

অশোকের ব্যর্থতা তাহাকে বিঁধিল। মনে হইল মাধুরী সেই চক্রান্তের আবরণ অপসরণ করিয়া অশোককে মুক্ত করিয়া দিবে।

অশোক মুক্ত হইলে মাধুরী রিক্ত হইবে কি-না, সে-ভাবনা মাধুরীর মনে স্থান পাইল না। মাধুরীর মধু-ভাণ্ডের ঐশ্বর্য্য মাধুরীকে অসম্মানের পথ হইতে বাঁচাইবে, এই বিশ্বাস তাহার আছে। এই বিশ্বাস তাহাকে যে দীপ্তি ও তেজ দিয়াছে, তাহা পুরুষকে চঞ্চল করিয়া দেয়। অশোক সেই চঞ্চলতায় উদ্বেলিত।

মাধুরী বলিল, তোমাকে আমি সার্থকতার পথের সন্ধান দেব, এ-তো আমার সৌভাগ্য। পুরুষকে মঙ্গলের পথে এগিয়ে দেওয়াই তো আমাদের ধর্ম্ম। তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আমার অন্তর ভরে আছে, এসংসারে তুমিতো সর্ব্বহারা নও।

অশোক কহিল, মাধুরী, তোমার অন্তরের মাধুরী আমার জীবনকে মধুময় করুক। তুমি হবে আমার জীবনের মধু। আজ থেকে তোমাকে "মধু" বলে ডাকবো।

মাধুরী হাসিল। তাহার কর্ণমূলে এক ঝলক রক্ত আসিয়া আবার চলিয়া গেল।

অশোক বলিল, তোমার স্রোতের ধারা আমার দিকে নিত্যকাল প্রবাহিত থাকবে, একথা আমি বলিনে এবং সে আশাও আমি করিনে। তোমার তরঙ্গ যেন আমাকে উত্তাল করে তোলে।

মাধুরী বলিল, অশোকদা, তোমরা আমাদের মন জান না,

তাই তোমরা চাও নিবিড়ভাবে এবং ত্যাগ করো নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। তোমাদের সঙ্গে কারবার করতে আমাদের সর্ব্বদাই ভয় হয়, কারণ তোমরা লোকসানকে ক্ষতি ভাবো না। ...দের ব্যবসা-বুদ্ধি কম। তাই অ-ব্যবসায়ী পুরুষদের সঙ্গে আমরা চলি সসঙ্কোচে। তুমি রাগ করোনা, ওটা তোমাদের পুরুষজাতের অপরাধ।

অশোক কহিল, ব্যবসাতে লাভলোকসান বড় জিনিষ নয়। ব্যবসা চলছে, এটাই আমাদের বড় লাভ।

মাধুরী বলিল, ঐখানেই আমাদের আপত্তি। আমরা লোকসানের ব্যবসা চালাতে চাইনে। তোমাদের কল্পনাশক্তি প্রবল, তাই তোমরা এগিয়ে যেতে পারো। আমাদের ব্যবসাবুদ্ধি বিচক্ষণ, তাই আমরা থেমে যেতে চাই। আশ্রয়হীনের জন্য বাসা বাঁধা আমাদের কাজ। কারণ, তাতে আমরা মুনাফা আশা করি।

অশোক ধীরে ধীরে বলিল, মধু, তোমার কাছে চাই শক্তি। আমি দুর্ব্বল, আবেদনের খাতা নিয়ে অর্গলবদ্ধ দ্বারে অনর্গল ঘুরে বেড়াতে হয়। তাই ক্লান্তি আসে—ধিক্কার আসে কিন্তু অর্গলদ্বার তেমনি বন্ধ থাকে। আমি সেই দ্বার খুলতে চাই। জীবনসমুদ্রে যেন আমি নিত্য-কাল সাঁতার দিয়ে মহাসমুদ্রে পৌঁছে যেতে পারি, ডাঙায় উঠে বিশ্রাম করতে চাইনে। আমি কালস্রোতের মাঝখানে আশ্রয় চাইনে, আমি যেন সুর মিলিয়ে নৃত্যের তালে চলে যেতে পারি। আমার কপালে তোমার হাতের টিপ জ্বলবে চিরকাল।

মাধুরী বলিল, তুমি আমাকে করতে চাও সিদ্ধির বাহন, আমার সঙ্গে সমন্বয়ের চেষ্টা তোমার নেই।

অশোক বলিল, তোমাকে আমি সীমায় বেঁধে রাখতে চাইনে, আমার মুনাফার লোভে তোমাকে বঞ্চিত করতে চাইনে। লোভের বশে যারা সমন্বয়ের চেষ্টা করে, তারা দুঃখই বাড়ায়। তাই তোমাকে আমি বাসনার চোখে দেখিনে। শুধু আমার আচ্ছন্ন দৃষ্টিকে মুক্ত করতে চাই তোমার আলোতে। তোমার প্রদীপে আমার শিখা জ্বালিয়ে নিতে হ'বে। ক্ষতি তোমার নেই, কিন্তু লাভ আমার প্রচুর।

মাধুরী বুঝিল যে, পুরুষ চলে কল্পনার বেগে, ছোটখাটো ক্ষতির আশঙ্কা তাহাকে বাধা দেয় না। সে নিজেকে নিয়াই ধ্যানস্থ, নারী তাহার সাধনার অঙ্গ মাত্র। নারীর প্রেমে সে যখন মাতে, সে তখন নিজেরই আগুন নিয়া খেলা করে। এই আত্মসর্ব্বস্ব পুরুষজাতিকে মাধুরী খুব বিশ্বাস করে না। পুরুষ নারীকে চায় নিজের দুর্ব্বলতায়, নারীকে দেবী ভাবে নিজের কল্পনার জোরে। নারী মিথ্যা স্তোকবাক্যে প্রতারিত হয়, ভাবে সে জয়লাভ করে নিজেরই মহিমায়। নারীর মহিমা শুধু পুরুষের কল্পনায়। যে-পুরুষের কল্পনা নেই, সে নারীকে খান্ খান্ করিয়া ফেলিতেই জানে। তাই নারী চায় শিল্পীর মন, কবির চিত্ত। যে নারী পুরুষের দৌরাত্ম্য ভালবাসে, অর্থাৎ যে লালসার বহ্নিতে প্রজ্জলিত, সেই গোষ্ঠীর দলে মাধুরী নয়। তাই মাধুরীর এতো ভয় এবং তাই অশোক তার কাছে

এতো প্রিয়। এবং প্রিয় বলিয়াই মাধুরী অশোককে বাধা দিতে পারে না এবং পথক্লান্ত অশোককে দূরে ফেলিয়া দিতে পারে না। যাহারা নিজের মনের সংবাদ অবহেলা করিয়া পরের মন নিয়া বেশী ভাবে, সংসারের ফাঁদ তাহাদের পথে পথে এবং তাহারা ধরাও পড়ে পদে পদে। তাই নারী শক্তি-রূপিণী হইয়াও এতো দুর্ব্বল।

জ্ঞানের সাহায্যে বিষয়বস্তুকে জানা যায়—তাই অশোক জানে বেশী। মাধুরী ভাবের সাহায্যে বস্তুকে গ্রহণ করিতে চায়—তাই সে বিষয়বস্তু না বুঝিলেও নিজেকে জানিতে পারে। জ্ঞানের ঝাঁঝ বেশী—তাই অনেক সময় জ্ঞান ও বিজ্ঞান কুপথের কাজ করে এবং মনের স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে। সুস্থ মন মিলিতে চায়—আনন্দ পাইতে চায়। জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে উপলব্ধি করা যায় না। মাধুরী অশোকের কাছে প্রিয় ও সুন্দর, কারণ মাধুরীর মধ্যে অশোক যেন নিজেকে পায়। পুরুষের কাছে নারীর আকর্ষণের একমাত্র ফর্ম্মুলা হইল যে কোন বিশেষ নারীর ভিতর পুরুষ নিজেকে খুঁজিয়া পায়। তাই লোকচক্ষুতে যে সুন্দর, সে-নারীই বিশেষ পুরুষের কাছে মধুর হইয়া উঠে না। কে কাহার ভিতর নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহার কোন বিধান নাই। অথচ এই উপলব্ধির প্রচেষ্টা না থাকিলে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ এলোমেলো ও অসংলগ্ন হইয়া যায়। শোভনার অপরাধ নাই কিন্তু তাহার স্বচ্ছ অন্তরে অশোক নিজেকে খুঁজিয়া পায় না। অথচ শোভনা ব্রততীর মত তাহাকে

অবলম্বন করিয়া আছে। অশোক মাধুরীর কাছে আসে নিজেকে পাইতে, নিজেকে বাঁচাইতে। সব নারীই যদি সব পুরুষকে পথের সন্ধান দিতে পারিত, কাহারও গৃহদাহ হইত না। এবং কেহই গৃহহীন হইত না।

মাধুরী অশোকের দিকে ক্লান্তদৃষ্টিতে তাকাইল এবং কাতর-স্বরে কহিল, অশোকদা, তুমি জয়ী হ'বে, আমি জানি।

মাধুরীর কথা অশোকের কাছে আশীর্ব্বাদের মত মনে হইল। অশোক চোখ বুজিয়া অবনতমস্তকে মাধুরীর কথা গ্রহণ করিল। অশোক কোন উত্তর দিতে পারিল না।

ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। অশোক চম্‌কাইয়া উঠিল, তাহার রাত্রে কাজ আছে। শোভনা হয়তো তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মানুষের অন্তর-বাহিরে যখন বেদনা, তখন মানবাত্মার আনন্দের বাণী কাণে পৌঁছায় না। মাধুরীর অন্তর আকাশের ফাঁক দিয়া সত্যের আলোর সন্ধান পাইত বলিয়াই অশোক জড় বস্তুরাশির জটিলতাকে অতিক্রম করিয়া অন্তরের সঙ্গে সহজ-ভাবে মাধুরীকে স্বীকার করিত। এখানে রিপুর সংঘাতে রিপু জাগিয়া উঠেনা—কারণ বাসনার চোখে অশোক মাধুরীকে দেখিত না। আমরা এই মিলনকেই খুঁজি। অথচ অন্তরের এই স্বার্থকতা কর্ম্মজগতের স্বার্থের ফাঁসে শ্বাসরুদ্ধ। বাহিরের আহ্বানে আমাদের অন্তর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। তাই অশোক শোভনাকে অস্বীকার করিতে পারে না—নাচিয়া নাচিয়া

তাহার জীবন-তরণী উর্ম্মিমালার সঙ্গে সঙ্গে সহজে মহাসমুদ্রে পৌঁছিতে পারে না। তাহার পথ সুদীর্ঘ—আমৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার তরণীকে কর্ত্তব্যের উজানপথে চালাইয়া নিতে হইবে।

অশোক নীরবে মাধুরীকে এক ক্ষুদ্র নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল। মাধুরী ভবিয়াছিল যে, যাইবার সময় তাহার শিক্ষক অশোকদাকে ঠাট্টা করিয়া বলিবে যে এই ভাবে অধ্যাপনার গতি চলিলে তাহার ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সমুদ্র পার হইতে পারিবে না। কিন্তু অশোকের নীরব ও মলিন মূর্ত্তি মাধুরীকে আঘাত করিল। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল অশোক তাহার শিক্ষক নয়, তাহার গুরু নয়, তাহার আত্মীয় নয়। তাহার শরীরের প্রতি শিরা রিমঝিম করিয়া উঠিল। মাধুরী প্রতিনমস্কার দিল না—চৌকি হইতে উঠিয়া অশোকের সঙ্গে বাহিরের ফটক পর্য্যন্তও আসিল না।

অশোকও যেন বাঁচিল।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল যে পথিকের সংখ্যা নাই, শুধু দুই একখানা মোটর শন্‌শন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। শী... রাত্রি, অশোকের মনে হইল যে কলিকাতার শীত চলিয়া গিয়াছে। আকাশের ধোঁয়া শুধু শীতঋতুকে স্মরণ করাইয়া দেয়। চারিদিকের স্তব্ধতা—দুই পার্শ্বের বড় বড় বাড়ী, রাস্তার পরিচ্ছন্নতা এবং বাস-লাইনের দূরত্ব, সব মিলিয়া যেন একটা বুর্জ্জোয়াভাব চতুর্দ্দিকে সুস্পষ্ট এবং সেখানে সে নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র মনে করিতে লাগিল। এই ক্ষুদ্রতা তাহাকে বাধা দেয়

এবং এই ক্ষুদ্রতার চিন্তা তাহাকে কশাঘাত করে। অথচ এই বিরাট ষড়যন্ত্রজাল ভেদ করিবার তাহার শক্তি নাই। অশোক চায় এই বুর্জোয়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে, কিন্তু এই সংসারে আঘাত না পাইলে কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না। তাই সে আঘাত করিতে চায়।

চার

বিমান শোভনাকে মাঝে মাঝে দেখিতে আসে স্নেহের টানে কিন্তু তাহাকে চলিয়া যাইতে হয় ব্যথিত মনে। শোভনা তাহার স্নেহরসে পরিপুষ্ট কিন্তু সংসারের ব্যথা ও বেদনা [illegible] এবং কিভাবে লুকাইয়া থাকিয়া শোভনাকে আবিষ্ট করিয়া [illegible]য়াছে, তাহা ভাবিয়া বিমান দুঃখিত হয়, কিন্তু কোন উপ[illegible]াই। মানুষ নিজের ভগ্নীদের পালন করে পরের হাতে তুলিয়া [illegible]তে, নিরুদ্দেশের পথে অগ্রসর হইতে। সেখানে ভ্রাতার স্নেহ [illegible]থের অভিশাপ হইতে ভগ্নীকে বাঁচাইতে পারে না, শুধু চো[illegible] জল ফেলিয়া নিজেকে শাস্তি দিতে পারে। শোভনা যখন বিমানদের বাড়ী হইতে বিদায় লইয়াছিল, শোভনা ছিল তখন তৃতীয়ার চাঁদ। সে তখন তার আঁচল শিথিলভাবে এলাইয়া দেয়, নিভৃত নির্জ্জনতার মধ্যে প্রতীক্ষা করে, কিন্তু সংসারের বাদল হাওয়ায় তাহার বিবাহ-মন্ত্র-পূত হৃদয়ের নীড়গুলি যেন ছিঁড়িয়া গেল—তাহার সুদীর্ঘ পথ দীর্ঘনিশ্বাসে ও আত্মনিবেদনে আরও দুর্গম হইল। বর্ষার আঁধার তৃতীয়ার চাঁদের জ্যোৎস্নাকে মলিন

করিয়া দিল। তাহার আলো হাওয়ায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, যে-কোন সময়ে নিবিয়া যাইতে পারে।

হাটখোলাতে বিমানের পাটের গদি। তাহারা পাটের আড়তদার। শোভনার কাছে আসিতে হইলে বিমান আর গদি হইতে বাড়ী ফিরিয়া যায় না এবং সরাসরি গর্চ্চারোডে আসিয়া উপস্থিত হয়। হগমার্কেট হইতে শোভনার জন্য ডালমুট কিনিয়া নিয়া যায়; ডালমুট শোভনা খুব ভালবাসে।

সেদিন বিমান মার্কেট হইতে ডালমুট ও চিকেনপেটিস্ কিনিয়া নিয়া গেল। শুধু ডালমুট নিয়া যাইতে ভাল লাগিল না। চিকেনপেটিস্ বিমান নিজে খায় না, স্পর্শও করিতে চায় না। কিন্তু শোভনা অশোকের অনুরোধে খাওয়া নিয়া কোন বিচার করে না। শোভনা সাধারণতঃ এই সব খাবার খায় না, তবুও শোভনার জন্য চিকেনপেটিস্ও নিয়া গেল। মনে মনে ভাবিয়া নিল যে, অশোক নিশ্চয়ই খুব সাগ্রহে পেটিস্ খাইবে। যাহা খাইলে বা পাইলে শোভনা সুখী হইবে, তাহা বহন করিয়া নিয়া যাইতে বিমানের আনন্দ। প্রিয়ব্যক্তির জন্য নিজের রুচিকে বিসর্জ্জন দিতে যে এতো সুখ, একথা বিমান আগে জানিত না এবং বুঝিতেও পারিত না। শোভনার দারিদ্র্য বিমানকে অনেক কিছু শিখাইয়াছে।

গর্চ্চারোডে যখন বিমান গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিকে তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। কিন্তু চন্দ্রের উদয় হইয়াছে কি-না, বোঝা যায় না। হয়তো

কোথাও অলক্ষ্যে চন্দ্রের রূপালি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। ধনীর প্রাসাদের সংলগ্ন বিস্তীর্ণ লনে বা ফাঁকা জায়গায় জ্যোৎস্নার পরিচয় পাওয়া সম্ভব কিন্তু গর্চ্চারোডের ফ্ল্যাটে বসিয়া আকাশে চাঁদ উঠে কি-না, তাহা জানা সম্ভব নয়। হয়তো যাদের জীবনে চিরবর্ষা, তাদের গোপন অতৃপ্তির আঁধারে জ্যোৎস্না আবৃত থাকে।

বিমান বাহিরের দরজার শিকল নাড়িল এবং "শোভা" বলিয়া ডাকিল। শোভনাকে বিমান "শোভা" বলিয়া ডাকে।

শোভনা ডাক শুনিল না কিন্তু শিকল নাড়ার শব্দ পাইল। দরজা খুলিয়া দেখিল যে, বিমান আসিয়াছে এবং হাতে দুটা কাগজের পুঁটলি।

হাতের জিনিষ শোভনাকে দিয়া বিমান ঘরে প্রবেশ করিল। শোভনা তখন কাগজের পুঁটলি দেখিতে ব্যস্ত। ডালমুট পাইয়া তাহার চোখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল কিন্তু প্যাটিস্ দেখিয়া সে খুসী হইল না, কারণ সে জানে যে তাহার দাদা প্যাটিস্ খাইবেন না, শুধু তাহাদের জন্যই আনিয়াছেন। দাদাকে নিজের ইচ্ছামত সে কোনদিন খাওয়াতে পারে নাই এবং দাদারই দেওয়া জিনিষও যে সে দাদার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া খাইতে অনুরোধ করিতে পারিবে না, তাহা ভাবিয়া সে দুঃখ পাইল। যে দুঃখী, সে মানুষের অনুকম্পার বেড়া জালে আবদ্ধ হইয়া সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে—অসীম আকাঙ্ক্ষার গর্ত্ত সে কোনদিন ভরাট করিয়া উঠিতে পারে না।

বিমানের দৃষ্টি শোভনার সর্ব্বাঙ্গে কোমল আদর বর্ষণ করিল। শোভনার হাসিই তাহার চোখে পড়িল কারণ যে-দিকটায় তাহার গভীরতম ক্ষত, সে তাহা আবৃত রাখিতেই চেষ্টা করে।

বিমান হাসিয়া কহিল, অশোক এখনও বাসায় ফেরেনি?

শোভনা কহিল, তিনি হয়তো রাত নয়টায় ফিরবেন, আবার রাত দশটায় চলে যাবেন।

—তোর একা থাকতে ভয় করে না? এই রাত্রির কাজটা অশোককে বদলাতে বল্। খবরের কাগজেতো অনেকে দিনেও কাজ করে।

—তিনি বলেন যে রাত্রের কাজে অনেক সুবিধা। সারাটা দিন সম্পূর্ণ নিজের থাকে। প্রয়োজন হ'লে দিনের বেলাটাকে নিজের কাজে ব্যয় করা যায়।

রাত্রির কাজের কি সুবিধা থাকিতে পারে, বিমান তাহা বুঝিল না। কারণ, সে জানে যে রাত্রিতে কাজ করিলে শোভনা থাকে একাকী। শোভনাকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া অশোক কি সুবিধা রাত্রির কাজে পায়, বিমান বুঝিল না কিন্তু বেশী প্রতিবাদও করিল না।

শোভনা কহিল, তুমি একটু বসো, আমি চা করে নিয়ে আসি।

শোভনা চলিয়া গেল। শোভনাকে চলিয়া যাইতে সে দেখিল। বিমানের মনে হইল যে, শোভনার শরীরটা ভাল নয়, সে যেন শুকাইয়া যাইতেছে। শোভনার চরণযুগলের গতি যে

ক্লান্ত, তাহা বিমান বুঝিল। শোভনার মুখে ছিল শান্তি এবং দেহে ছিল স্বাস্থ্য কিন্তু এখন তাহার নেত্র ম্লান, মুখ মলিন এবং দেহ অবসন্ন। পতিগৃহে আসিয়া শোভনা যেন অস্তের দিকে চলিয়া পড়িতেছে। বিমানের মনটা ব্যথায় কন্‌কন্‌ করিয়া উঠিল। দীর্ঘশ্বাসকে চাপিয়া একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিল।

শোভনা এক পেয়ালা চা ও প্লেটে করিয়া ডালমুট নিয়া আসিল। বিমানের মনে তখনও শোভনার অসুস্থতার চিন্তাই ঘুরিতেছিল। তাই চায়ের পেয়ালাটা শোভনার হাত হইতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শোভা, চল্‌ না, আমাদের বাড়ীতে কিছুদিন থেকে আসবি। অনেকদিন তো যাস্‌নে।

শোভনা হাসিয়া বলিল, তোমাদের বাড়ীতে যেতে পারি কিন্তু থাকা কি সম্ভবপর হ'বে!

বিমান কহিল, সম্ভব হবে না কেন? তোর শরীরটা খারাপ। তোর একটু হাওয়া বদল দরকার। ভাবছি, মা-ও তো অসুখে ভুগছেন। তোকে দিয়ে মাকে মধুপুরে পাঠিয়ে দেবো—সেখানে অনেক চেনা লোক আছে।

শোভনা খুসী হইল, শুধু কহিল, বাবা কি রাজী হবেন?

বিমান হাসিয়া উত্তর দিল, আমরা রাজী না করাতে পারলেও তুই তাঁকে সম্মত করাতে পারবি। তোকে কিছু বলবেন না।

শোভনার হাসি মিলাইয়া গেল। বুঝিল, তাহার মধুপুরে যাওয়া সম্ভব নয়—শ্যামবাজারে যাওয়াও সম্ভব নয়। অশোককে একা ফেলিয়া সে কি করিয়া যাইবে, অশোকের সংসার

ফেলিয়াও সে যাইতে পারিবে না। শোভনা জানে যে, সে চলিয়া গেলে অশোকের সংসার অচল হইয়া যাইবে। অশোকের খাওয়া-শোওয়া কিছুই স্থির থাকিবেনা। লোকে ভাবে যে, তাহারা সংসারে দুইটি লোক—বেশ সুখে আছে। কিন্তু অশোকের মত খেয়ালী ও উচ্চাভিলাষী যুবককে নিয়া সংসার করিতে হইলে যে এতো ক্ষুদ্র সংসারেও কত জটিলতা গড়িয়া ওঠে, তাহা যাহারা না জানে, তাহারা বুঝিবেনা। সংসারে যাহাদের আকাঙ্খা নাই বা যাহাদের আকাঙ্খা পরিপূর্ণ, তাদের সংসারে বাঁকও নেই, পাঁকও নেই—সহজগতি, যথাস্থানে যথাসময়ে তাহারা পৌঁছিতে পারে। কিন্তু অন্তহীন যাহাদের আকাঙ্খা, পরাজিত যাহারা আকাঙ্খা পরিপূরণে, অথচ শক্তির যাহারা অধিকারী হইয়াও তলাইয়া যাইতেছে—মোটের উপর ব্যর্থতা সম্বন্ধে যাহারা সচেতন, তাহাদের সংসারে জটিলতা এতো থাকে যে, বাহির হইতে তাহা বুঝা যায় না।

শোভনা মৃদুস্বরে বলিল, কিন্তু আমি কি করে যাই!

বিমান খুসী হইল না। সে বলিল, অসুখ হ'লেও তোরা যেতে পারবিনে? অসুখের সময়ও কি তোকে আমার কাছে নিতে পারবোনা?

শোভনা চমকিত হইল, বুঝিল যে তাহার দাদা দুঃখিত হইয়াছেন। শোভনা বলিল, আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করব।

বিমান শোভনাকে আদর করিয়া বলিল, লক্ষ্মী বোন, তুই

যেতে অস্বীকার করিসনে, তোকে সুখে রাখবার দাবী থেকে আমায় বিদায় দিস্‌নে। অশোকের যাতে কোন কষ্ট না হয়, তা আমি দেখবো। তুই চাকর রেখে দিয়ে যা, তার খরচ আমি দেব।

শোভনা চুপ করিয়া রহিল।

বিমান কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শোভনার দিকে তাকাইল। শোভনার শূন্যদৃষ্টি বিমানকে আঘাত করিল।

বিমান বলিল, শোভা, অশোক যদি মফঃস্বলে যায়, আমি একটা চাকুরী দিতে পারি। আমাদের মফঃস্বলের আড়তে একজন ভাললোক প্রয়োজন। পাটের বাজার মন্দা তা তো তুই জানিস। তাই আমাদের সিরাজগঞ্জের গোলায় একজন প্রধান কর্ম্মচারী চাই—পাটের বেচা-কেনা ছাড়া, আমাদের লগ্নীকারবারও দেখতে হ'বে। আজকাল মামলা ছাড়া লগ্নীর টাকা আদায় হয় না, তাই সে-সব তত্ত্বাবধান করা দরকার।

শোভনা কহিল, দাদা, তুমি না বলতে যে, ব্যবসা আত্মীয় নিয়ে চালানো যায়না। ব্যবসাক্ষেত্রে আত্মীয়দের ও যৌথ-পরিবারের দাবীই না-কি সর্ব্বনাশের কারণ।

বিমান স্বীকার করিয়া কহিল, আমি জানি সব, শোভা, বুঝিও সব। আমি তোর দাদা হয়ে অশোককে চাই—পাটের দালাল হিসেবে নয়। আমি জানি, তাতে বিপদ আছে কিন্তু সেই বিপদতো আমি জেনেশুনে বরণ করছি।

শোভনা বলিল, দাদা, আমি চাইনে যে তুমি তাকে

তোমার ব্যবসাতে নাও! তাতে গরমিল বাড়বে। তুমি ভাবছো যে তোমার ভগ্নীপতিকে অবলম্বনের পথ খুঁজে দিলে কিন্তু আমি ভাবছি যে, তুমি সেপথ খুঁজতে গিয়ে আমার পথের কাঁটা না বাড়াও।

বিমান কহিল, আমি সব স্বীকার করি কিন্তু তবুও আমি অশোককে স্থির দেখতে চাই—তাতে আমার একটা আড়ত নষ্ট হয়, আমি কিছুই মনে করবোনা।

শোভনা কহিল, কিন্তু সেই ক্ষতি আমার পক্ষে স্বীকার করা মুস্কিল হ'বে। তুমি ভেবে দেখো।

বিমান বলিল, আমি ভেবে দেখেছি। তুই বাধা দিস্‌নে। আমি বিশ্বাস করি যে অশোককে পেলে আমাদের সুবিধে হ'বে। বাবা একশ'টাকা পর্য্যন্ত মায়না মঞ্জুর করেছেন। আর বাকী যা দরকার এবং অশোক যা চায়, আমি আমার অংশ থেকে দেবো। বাবা জানতেও পারবেন না।

শোভনা দাদার দিকে একবার তাকাইল। তাহার দেবতার মত দাদার আশ্রয়ে যাইতে শোভনা কিছুই অন্যায় দেখিল না। ভাবিল যে তাহার আশ্রয়ে থাকিলে ঝড়ের ঝাপ্‌টা তাহার শরীরে লাগিলেও আঁচড় দিতে পারিবেনা। জীবনের প্রথম যাত্রারম্ভে যাহারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কাছে এতো বড় আশ্রয়ের আমন্ত্রণ সত্যই অমূল্য। কিন্তু সংসারে এমন লোক আছে যে, যাহারা ডাঙ্গায় উঠিয়া বিশ্রামের নীড় বাধিতে চায়না, তরঙ্গের গর্জ্জন তাহাদের

নেশার মত টানিয়া নেয়। অশোক অনেকটা সেই ধরণের লোক, তাই বিমানের আমন্ত্রণ পাইয়াও শোভনা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলনা।

শঙ্কিত মনে শোভনা কহিল, যদি উনি আপত্তি করেন?'

বিমান অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। তবুও যেই কথাটা মনে আসিল, সেই কথাটা বলিলনা। শুধু বলিল, তুই বুঝিয়ে বলবি। এতে মান-অপমান নেই। আমাদের প্রয়োজন, তাই অশোককে আমরা চাই। বলবি যে, বাবার ইচ্ছে যে, অশোক আমাদের ব্যবসাতে একটু সাহায্য করে। আপাততঃ দেড়শ' টাকা পাবে, পরে আরও বাড়বে।

শোভনা কি বলিবে, ভাবিয়া পাইলনা।

বিমান উৎসাহ সহকারে বলিল, আমি জানি যে অশোক অভিমানী। তাই আমাদের দরকারটাই যে বড়, সে কথাটা বুঝিয়ে দিস্। একবার ব্যবসাতে ঢুকলে দেখবি, অশোকের ব্যবসাবুদ্ধি জেগে উঠবে। লাভ-লোক্সান যারা বুঝতে শিখেছে, তারা যেখানেই থাকুক, তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হ'বেনা। আমাদের দেশে এই সাধারন লাভলোক্সান জিনিষটা অনেকে বোঝেনা বলেই ক্ষতির দাবীর আর অন্ত থাকেনা। শোভা, মুনাফার লোভ যারা পেয়েছে, তারা মুনাফা ছাড়তে কখনও পারে না। আমি চাই যে, অশোকের মুনাফাবোধ জেগে উঠুক।

শোভনা বুঝিল সব কিন্তু কিছুই বলিল না। অশোককে

শোভনা যতটা জানে, বিমান ততটা জানেনা। তাই বিমান বলিয়া গেল অনেক কিছু কিন্তু শোভনা কিছুই উত্তর দিতে পারিলনা।

বিমান বলিল, অশোক যদি সিরাজগঞ্জে যায়, তুই আমাদের ওখানে কিছুদিন থাকবি। তারপর তোকেও সিরাজগঞ্জে পাঠিয়ে দেব।

সিরাজগঞ্জে গিয়া স্বামীর সঙ্গে একা থাকিবে, এই কল্পনাটুকু শোভনার ভাল লাগিল। কলিকাতার বিশালতা ও বহুমুখী আকর্ষণ সেখানে নাই, দরিদ্র সংসারের দৈনন্দিন অনটন সেখানে থাকিবে না, রাত্রিতে একাকী তাহার কাটাইতে হইবেনা। কল্পনার সুতায় শোভনা অল্পক্ষণেই অনেক কিছু বুনিয়া ফেলিল। সে তৃপ্তি পাইল, বহুদিন পরে সে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল।

বিমান আঁত্‌কাইয়া উঠিল। সে শোভনার আরামের নিঃশ্বাসকে বুকের দীর্ঘশ্বাস বলিয়া ভুল করিল। আদরের সঙ্গে বিমান বলিল, অশোককে ছেড়ে যেতে তোর এতো কষ্ট করে কেন, অসুখ করলে তো তোর বৌদিরাও বাপের বাড়ী যান। আমাদের কাছে তোর আসতে ইচ্ছে করে না ?

শোভনা জিভ্‌ কাটিয়া অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, দাদা, তোমার আশ্রয়ইতো আমার বড় সম্বল। সে সম্বল আমি কৃপণের মত রাখতে চাই, অপব্যয়ের ভয়ে ব্যবহার করতে চাই নে। তোমার মত দাদা যে পেয়েছে, তার কোন ভয় নেই, একথা আমি জানি।

শোভনার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া গেল। টেবিলের উপর একটা ঘড়ি টিক্‌টিক্ করিয়া বাজিতেছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিল যে আটটা বাজিয়া গিয়াছে। শ্যামবাজারে ফিরিতে প্রায় একঘণ্টা লাগিবে।

তাই বিমান উঠিয়া বলিল, আজ যাই। তোকে যা বলে গেলাম, অশোককে বুঝিয়ে বলিস। আমি দু'চার দিনের ভিতর তোকে নিতে আসবো।

শোভনা শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিমান চলিয়া গেলে শোভনা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

রাত্রি প্রায় নয়টার পর অশোক বাড়ী ফিরিল। হরিশ মুখার্জী ষ্ট্রীটে একটি ছোট্ট দোতালা বাড়ীতে তাহার বন্ধু জ্ঞানানন্দ বসু থাকে। সেখানে তাহার বন্ধুদের এক সান্ধ্য বৈঠক আছে। সেখান হইতে ফিরিতে তাহার দেরী হইয়া যায়, তবে দশটার ভিতর ফিরিতেই হয়, কারণ রাত্রে কাজ আছে। মাঝে মাঝে বাসায় না ফিরিয়া বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়া শেষ করিয়া সে অফিসে চলিয়া যায়, বাসায় বন্ধুর চাকর দিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। শোভনা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে। না আসিলে ভাবে, অফিসে চলিয়া গিয়াছে। তবুও মাঝে মাঝে শোভনা চিন্তিত হইয়া পড়ে। তাহার পাশের ফ্ল্যাটে একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক থাকেন এবং সেখানে টেলিফোন আছে, তাঁহার

স্ত্রী বাঙালী, শোভনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছে। তাই সেখান হইতে ফোন করিয়া জানে যে অশোক অফিসে গিয়াছে কি-না? সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাঙালী স্ত্রী—নাম সতী দেবী—শোভনার একজন বড় সহায়ক বন্ধু। তাহার সাহায্য ব্যতীত একাকী শোভনার পক্ষে সেই গর্চ্চারোডের ফ্ল্যাটে থাকা সম্ভব হইত না।

অশোক বাসায় ফিরিয়া শোভনাকে দেখিয়া একটু হাসিল। সে বেশ বুঝিল যে সেই দুপুরে সে বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং এতো রাত্রে ফিরিয়া সে শোভনার প্রতি অবিচারই করিয়াছে। এমনি অনুতপ্ত সে হয় কিন্তু অনুতাপ প্রকাশ করে না। এমন ভাব দেখায় যে এমন একটা বিশেষ অপরাধ তাহার হয় নাই; বাহিরে কাজ ছিল, তাই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অশোক দুপুরে অফিসে গিয়াছিল, কারণ অফিসের লোকমুখে সে শুনিয়াছিল যে সেদিন ম্যানেজারকে অনুরোধ করিলে মাহিনার অনেকাংশ পাওয়া যাইতে পারে। কোথা হইতে না-কি একটা মোটারকমের টাকা আসিয়াছে। এই সংবাদ সম্পাদক-বিভাগের অনেকেই জানিতেন, তাই অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। ম্যানেজার তাহাদের মাহিনা দিতে অসমর্থ হইলেন, কারণ যে-টাকা তিনি পাইয়াছেন তাহা পাওনাদারদের দাবী মিটাইতে হইবে এবং অবশিষ্ট টাকা প্রেসকর্ম্মচারীদের মাহিনা মিটাইতে শেষ হইয়া যাইবে। ম্যানেজার জানেন যে, সম্পাদকীয় বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা মাহিনা না পাইলেও

ধর্ম্মঘট করিবেনা কিন্তু প্রেসের কর্ম্মচারীদের বেশীদিন মাহিনা না দিয়া রাখা যায়না। সম্পাদকীয় বিভাগও ঐ প্রেসকর্ম্মচারীদের মাহিনা দিতে আপত্তি করিলনা, কারণ তাহারাও জানে যে প্রেসের লোক মাহিনা না পাইলে কাজের অনেক গণ্ডগোল হয়। ম্যানেজার সম্পাদকীয় বিভাগদের আর একটা তারিখ বলিয়া দিলেন যে-দিন অন্ততঃ তাহাদের অবশিষ্ট মাহিনার অধিকাংশ দিয়া দিবেন। কিন্তু যাহাদের বলিয়া দিলেন, তাহারা তারিখ শুনিয়া গেল বটে কিন্তু কেহই আশ্বস্ত হইল না।

অফিস হইতে অশোক হরিশ মুখার্জ্জির আড্ডায় গিয়াছিল এবং সেখানে হইতে বাড়ী ফিরিতে-দেরী হইয়া গেল।

হাসি দেখিয়া শোভনা উৎসাহ পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আজ মাইনে পেয়েছ?

অশোক সাধারণতঃ সোজা কথার উত্তর সোজাভাবে দেয়না। সে উত্তর দিল, কেন, তোমার টাকার দরকার আছে না-কি?

শোভনা ম্লান হাসি হাসিল। টাকার দরকার থাকি ই যদি টাকা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ভাবনার কোন কারণ থাকিত না।

শোভনা উত্তর দিল, যদি মাইনে পেয়ে থাক, তাহ'লে দরকার আছে বৈ কি।

অশোক জানাইয়া দিল যে মাইনে সে পায় নাই এবং কবে পাইবে, সে-কথাও সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে পাইবে, এই বিশ্বাস তাহার এখনও আছে।

অশোক হাসিয়া কহিল, মাইনে পাইনি বলে তুমি দুঃখিত হয়েছ। কিন্তু কতলোক যে কাজ করবার সুযোগ পর্য্যন্ত পায় না, তা তো তুমি দেখছো না। আমাদের দেশে সব কাজে লাভের অংশ বেশী, তাই বেশী লোক বঞ্চিত। এই লাভের অংশকে সবার ভিতর না ছড়িয়ে দিতে পারলে, আমাদের মাইনেও আসবেনা এবং লোকে কাজের সুযোগও পাবেনা।

শোভনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, লাভের অংশ যাঁরা অর্জ্জন করছেন, তাঁরা তোমাকে বিলিয়ে দেবেন কেন? তাঁরা করবেন অনুগ্রহ, কিন্তু তোমার দাবী তো নেই।

অশোক উৎসাহের সঙ্গে বলিল, যেখানেই লাভ, সেখানেই প্রবঞ্চনা। জগতের স্বাভাবিক নিয়মে তুমি খেটে খাবে, আর আমি লাভ করে সম্পত্তি গড়বো, তার অধিকার নেই।

শোভনা বলিল, তুমি তো জানো যে, আজ জগতে যা কিছু সম্পদ আছে এবং যাঁরা দেশের সম্পদ গড়েছেন, তাঁরা সব লাভের টাকা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তির সম্পত্তিই তো সমাজের সম্পদের বাহন হয়েছে। এক জায়গায় যে যা লুট করেছে, আর এক জায়গায় সে প্রকাশ করেছে মঙ্গলকে। এই মঙ্গলস্রষ্টাদের তুমি লুণ্ঠনকারী বললে শুধু নিজেকে ঠকাবে।

অশোক হাসিয়া বলিল, আজকাল দেখছি যে তুমি বুর্জ্জোয়াদের কথাগুলোকে বেদ বলে গ্রহণ করছো। যে-মঙ্গল প্রচেষ্টায় ব্যক্তি প্রধান হয়ে পড়ে, সে চেষ্টা হ'লো বুঞ্চিতদের ভুলিয়ে রাখা। আজ সম্পত্তির অধিকারীরা যদি

সম্পদ সৃষ্টি না করতো, তাহ'লে তাদের সম্পত্তির আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসতো। সম্পত্তি যতদিন সম্পদ সৃষ্টি করতে কার্পণ্য করবেনা, ততদিন সম্পত্তির জয় ঘোষিত হবে এবং আমরা প্রবঞ্চিত হবো। কিন্তু আজ সম্পত্তি তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাই সম্পত্তি এতো অনাদৃত এবং আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

শোভনা চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনে ঘুরিতেছে তাহার দাদার কথাগুলি যাহা সে বলিবার জন্য উদগ্রীব। অশোক মাহিনা পায় নাই শুনিয়া সে আশাহত হইয়াছে এবং ভাবিতেছে কি করিয়া এখন সে সংসার চালাইবে। এতো সব ভাবনার উত্তেজনায় শোভনা স্বামীর সঙ্গে তর্কের সুরে বলিল, আমি জানি যে ধনীর দয়া যখন কমে, ভিখারীর কলরব তখন বাড়ে। আজ ধনীর লাভ কমে গেছে, তাই চতুর্দ্দিকে কলরব উঠেছে যে ধনীরা শোষণ করছে। মুনাফা না পেলে তারাই বা মুনাফা বিলিয়ে দেবে কি করে? চতুর্দ্দিকে চেষ্টা চলছে ধনীর লাভের পথকে দুর্গম করতে, অথচ ধনীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ যে তাদের দ্বার পূর্ব্বের মত খোলা থাকেনা। ধানের গোলায় ধান পুড়িয়ে দিয়ে দুর্ভিক্ষের সময় ধান নেই বলে আপশোষ করে লাভ নেই, একথা তুমি বিশ্বাস করো?

অশোক শোভনাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, তাইতো দেশের দুর্দ্দিনকে আমি অভিনন্দন করি। দেশের দুর্গতির দিনে ধনীর প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে। আজ দেশের কোন

ব্যবসায়ে মুনাফা নেই, তাই এখন লোকে বুঝবে যে ওদের দানশীলতা ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল মুনাফার উপর। তাই আজ মাইনে পাইনে বলে আমি দুঃখিত নই, কারণ অর্থবান রাজনৈতিক নেতাদের দম্ভ একটু কমবে। ওদের দম্ভের মূলভাণ্ড কোথায় ছিল, দেশের লোক তা বুঝবে।

শোভনা কহিল, কিন্তু আমাদের সমস্যা তো আরও বেড়ে যাবে। নিজেকে অবহেলা করে সমাজের মঙ্গলের জন্য নতুন ব্যবস্থা পরিকল্পনা করলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই যে মুস্কিল হ'বে।

অশোক চট্ করিয়া কহিল, না, আর নিজেকে অবহেলা করব না। ভাবছি যে, তুমি কিছুদিন বাপের বাড়ী গিয়ে থাকো এবং আমি কিছুদিন মেসে বাস করি। নইলে নিজের সমস্যা এতো প্রকট হ'বে যে, সমাজের সমস্যার ভাববার অবকাশ পারো না।

অন্যদিন হইলে শোভনা এই পিত্রালয়ে যাইবার প্রস্তাবে দুঃখিত হইত এবং সেখানে যাইতেও অসম্মত হইত। কিন্তু শোভনা আজ দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ ভাবিল যে ভালই হইয়াছে। তাহার দাদা বিমান তাহাকে যে-ভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে শ্যামবাজারে কিছুদিন না থাকিয়া আসিলে চলিবেনা। অথচ, শ্যামবাজারে গেলে যে অশোকের চলিবে কি করিয়া, তাহা ভাবিয়াই সে চুপ করিয়া যায়। অশোকের কাছে থাকিয়াই শোভনা অশোককে পায়না, দূরে থাকিলে

যে অশোক আরও দুর্লভ হইবে। এই চিন্তাও তাহাকে পীড়া দিত। কিন্তু সে তাহার দাদাকে দুঃখ দিতে পারে না। এবং তাহার নিজের শরীরটাও যে ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহা শোভনা বুঝে। দেহের স্বাস্থ্যকে অটুট রাখিবার জন্য স্বামীর গৃহ ছাড়িয়া পিত্রালয়ের যত্ন ভোগ করিতে শোভনার কোন দিন ইচ্ছা হয় নাই। শুধু তাহার দাদার দিকে তাকাইয়াই শোভনা পিত্রালয়ে যাইবার প্রস্তাবে চমকিত হইল না।

তাই শোভনা বলিল, দাদাও বলছিলেন যে একদিন এসে তিনি আমাকে শ্যামবাজারে নিয়ে যাবেন।

অশোক কহিল, তোমার দাদা এসেছিলেন? তিনি তো এবার অনেক দিন পরে এলেন।

শোভনা হাসিমুখে কহিল, তিনি তোমার জন্য চিকেন্ প্যাটিস্ এনেছেন। এখন খাবে?

অশোক হাসিয়া কহিল, চল, ভাত খাবার সঙ্গেই খাবো।

অশোকের ভাতের থালা সাজাইয়া আনিয়া শোভনা শোবার ঘরে একটা ছোট টেবিলের উপর রাখিল। অশোক একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া বলিল, প্যাটিস্ তুমি খেয়েছ?

শোভনা মৃদুস্বরে বলিল, হাঁ।

কিন্তু শোভনা প্যাটিস্ খায় নাই—পাছে স্বামীর অংশে কম পড়িয়া যায়, তাই হাঁ বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অশোক বলিল, তাহ'লে তুমি তোমার দাদাকে বলো যে, তুমি সেখানে যাবে। আমি একটা সস্তায় মেস্ দেখে নেবো।

শোভনা কহিল, কিন্তু বাড়ী ছাড়তে হ'লে তো কিছু টাকার দরকার।

অশোক হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, টাকা এনে দেবো। টাকা ধার করবার মত ক্রেডিট্ এখনো আছে।

শোভনার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

শোভনা কহিল, দাদা বলছিলেন যে তুমি যদি মফঃস্বলে চাকুরী কর, তিনি একটা দিতে পারেন।

"মফঃস্বলে" ?—বলিয়া অশোক ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তারপর বলিল, কোথায় সেই চাকুরী ?

শোভনা কহিল, সিরাজগঞ্জে। দাদাদের সেখানে পাটের আড়ত আছে। এবং তাদের লগ্নীকারবার প্রভৃতিও দেখতে হ'বে।

অশোক হাসিয়া কহিল, মফঃস্বলেই যদি যাই, বাংলার বাইরে যাব। বাংলার মফঃস্বলের চেয়ে কলকাতা অনেক ভাল।

শোভনা কহিল, কিন্তু সব জায়গায় তো চাক্‌রী পাওয়া যায়না।

অশোক অসন্তোষের সঙ্গে বলিল, চাকরী পাইনে বলেই যে তোমার দাদাদের লগ্নীকারবারে সাহায্য করবো, এ-অনুরোধ তোমার করা উচিত নয়।

শোভনা ব্যথা পাইল। তাহার দাদাকে ব্যথা দিলে যে সব ব্যথাটুকুই সে নিজে পায় !

শুধু সে কহিল, যদি অনুচিত মনে করো, তা হ'লে যেয়োনা। দাদা বলে গিয়েছিলেন, তাই তোমাকে জানালেম। চাকুরী গ্রহণ করা, তোমার ইচ্ছা।

অশোক শোভনার দিকে না তাকাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, লগ্নীকারবার হ'লো শোষণের নিকৃষ্ট উপায়। এতো সহজে এতো বেশী সুদ পাওয়া যায় বলেই আমাদের দেশের অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যে না গিয়ে যায় চাষীদের শোষণ করতে। এই মহাজনী প্রথা আমাদের সম্পদ্‌কে বিকল করে দিচ্ছে। মহাজনীর স্বাদ যারা পেয়েছে, তাদের দিয়ে ব্যবসা করা যায়না। তাই শিল্পের উন্নতি নেই, অথচ কৃষকের ঋণ বাড়ছে। এই মহাজনই আমাদের দেশের পরম শত্রু।

এই কথাগুলি যদি অশোক শোভনার দিকে তাকাইয়া বলিত, তাহা হইলে শেষ করিতে পারিতনা। শোভনা আহত পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু অশোক তখন শোভনার দাদার দেওয়া প্যাটিসের আস্বাদ পাইয়া তাহার কথার বিষ কোথায় গিয়া ছড়াইয়া পড়িল, তাহার খোঁজ রাখিল না।

শোভনা চোখের জল মুছিয়া বলিল, তোমরা শুধু আঘাত করতেই জানো, মানুষকে শ্রদ্ধা করতে জানো না।

শোভনার কম্পিত ভারী কণ্ঠস্বর অশোকের চেতনা আনিল। অশোক চোখ চাহিয়া দেখিল যে শোভনার চোখের জল তাহার মলিন গণ্ড বাহিয়া দর দর করিয়া পড়িতেছে। শোভনা

তাহার আঁচল দিয়া মুছিয়া নিঃশেষ করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সফলকাম হইতেছে না। দুঃখ যাহাদের অন্তরে জমাট বাঁধিয়া থাকে, তাহাদের রুদ্ধ চোখের জল একবার আসিতে থাকিলে সহজে থামিতে চায় না। সেই অশ্রু যাহাদের চোখকে কোনদিন প্লাবিত করিয়া দেয় নাই, তাহারা সেই বেদনা কখনও বুঝিতে পারে না। অশোকও পারিল না, তাই মনে মনে ভাবিল, "এই সামান্য কথায় এতো অশ্রুর প্রয়োজন ছিল না।" কিন্তু যেই আঘাতে শোভনার চোখে জল দেখা দিল, সেই অশ্রুতে অনেক বেদনার ইতিহাস জড়িত।

অশোক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, শোভনা, তুমি কাঁদছ ?

আজ অশোকও আর কোন সান্ত্বনা দিতে পারিল না। শোভনার আতুর চোখের চাউনির মূল্য কত, অশোক তাহা জানে না অথবা বুঝে না।

পাঁচ

আজ শনিবার। বিমান আসিয়া শোভনাকে লইয়া যাইবে। কাল রবিবার—অশোক কালীঘাট রোডের একটা মেসে উঠিয়া যাইবে। অশোক শোভনাকে পঞ্চাশটি টাকা আনিয়া দিয়াছে। সংসার ভাঙিয়া দিতে যে খরচ লাগে তাহা শোভনা অশোককে জানাইয়াছিল। কিন্তু কত লাগিবে, তাহা জানায় নাই। বাড়ী ভাড়া কুড়ি টাকা, তাহা দিবার ভার অশোকের উপর। বাড়ী ভাড়াও দুই মাসের বাকী পড়িয়াছে। একজন কর্পোরেশন কাউন্সিলারের বাড়ী, সে অশোককে একটু খাতির করে। কারণ কাউন্সিলার হইয়া সংবাদপত্রের লোকদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিবার উপায় নাই। অশোক তাহাকে জানাইয়াছে যে, তাহারা-বাড়ী ছাড়িয়া দিতেছে এবং অবশিষ্ট ভাড়ার টাকা ক্রমশঃ শোধ করিয়া দিবে।

শোভনা পঞ্চাশ টাকা হাতে পাইয়া জানাইল যে ইহাতে তাহার সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া যাইবে। অশোক খুশী হইল, কিন্তু শোভনার ঋণের অঙ্ক আরও বেশী। তাহার মুদী, ধোপা,

ঝি, সবই বাকী। তাহার বন্ধু সতী দেবীর নিকট হইতে কিছু-দিন আগে অশোকের অসুখ বাবদ চল্লিশ টাকা ধার করিয়া-ছিল—তাহাও শোধ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার সময় তাহা শোধ করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। অশোকের রোজগার কম হইলেও সখ আছে। সে বন্ধুদের বিবাহে উপহার অল্প খরচে দিতে পারে না, বন্ধুদের খাওয়াইতে হইলে কার্পণ্য দেখাইতে পারে না। এক একটা হুজোগে কত খরচ হয়, অশোক হিসাব রাখে না। অথচ কোথাও কার্পণ্য দেখিলে অসন্তুষ্ট হয়। অশোক বলে—"সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হ'লো বুর্জ্জোয়া মনের লক্ষণ।" শোভনার তাল সামলাইয়া চলিতে হয়। তাল ভঙ্গ হইলে মন কষাকষি হয় কিন্তু সমস্ত ছন্দ বজায় থাকিয়া সংসার চলিয়া গেলে শোভনা কোন প্রশংসাই পায় না। এই ঔদাসীন্য শোভনাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে সবচেয়ে বেশী।

সতী দেবীর স্বামী ব্যাঙ্কে কাজ করেন, তাই নয়টার সময় আপিসে চলিয়া যান। শোভনা সাড়ে নয়টার সময় সতী দেবীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। সতী দেবীদের ফ্লাটটা অনেক বড় এবং সুসজ্জিত।

শোভনাকে দেখিয়া সতী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমরা চলে যাচ্ছ?

শোভনা মৃদু হাসিয়া কহিল, হাঁ, দাদা ছাড়লেন না, তাই যেতে হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। তুমিই তো আমার বিপদের বন্ধু ছিলে।

সতী দেবী কহিলেন, না ভাই, তুমি তবুও এক সঙ্গী ছিলে। এখন সারাদিন নিজের মেয়ে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। তুমি জানো যে পাঞ্জাবীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে বলে আমাদের আত্মীয়-মহলেও আমি আদরের আসন পাইনে। বাবা লাহোরে থাকলেও তাঁর ঐশ্বর্য্য ছিল, তাই বাঙলা দেশের আত্মীয়দের মধ্যেও তাঁর খাতির ছিল। আজ বাবা নেই, আমি পাঞ্জাবী-স্বামীর স্ত্রী, তাই কত কাণাকাণি—কত অস্পষ্ট হীন ইঙ্গিত, তাতো ভাই জানো না। বাঙালী-সমাজে মেয়েদের জীবন এতো আড়ষ্ট, লাহোরে থেকে জানতেও পারিনি!

শোভনা হাসিয়া কহিল, এতে কাণাকাণি করার কি আছে! তুমি তো আর তাদের গলগ্রহ হয়ে থাকোনা। আত্মীয়-স্বজন মেয়েদের ভয় করে, পাছে তাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে পড়ে। আমরা-যে পরের অনুগ্রহের ভিখারী।

সতী দেবী কহিলেন, কেন বোন, নিজেকে এতো ছোট করো? আমাদেরও তো দাবী আছে, পুরুষের জীবনের আকর্ষণ-ই তো আমরা। আমরা সরে পড়লে, ওরা ভূমিকম্পের মত ভেঙে পড়বে। সেই ধ্বংসলীলার কাঠি তো আমাদেরই হাতে।

শোভনা শঙ্কিত মনে কহিল, দাবী আমাদের আছে কিন্তু দাবী খাটাবার শক্তি যে নেই। নিজেদের আত্মনিবেদনে সব শক্তিইতো নিঃশেষ করে ফেলেছি। আমরা যে বড় অসহায়।

সতী দেবী হাসিয়া কহিলেন, আমরা নিজেদের সব দিয়ে

ফেলি বলেই চাইতে পারিনে। ফলে, আমাদের দেওয়ার কদর থাকে না। পাওয়া ও দেওয়ার মিলন না হলে ফুলও ফোটে না, ফলও ফলে না।

শোভনা কহিল, উপায় কি দিদি, পুরুষ-যোদ্ধাদের জয় নিশ্চিত, কারণ তাদের ব্যূহের মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে জানি কিন্তু বেরুবার পথ চিনিনে।

সতী দেবী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, পুরুষতো সেই অহঙ্কারেই আছে। তাই পুরুষকে দুর্ব্বল করতে না পারলে মেয়েদের দাবী মিটবে না। দুর্ব্বল করবার কৌশল তোমাকে আয়ত্ত করতে হ'বে। এই সতর্কতা যে-মেয়ের না-থাকবে, সে পাবে দুঃখ।

শোভনার মনটা ছ্যাঁক করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, হয়তো পুরুষকে দুর্ব্বল করিবার কৌশল সে জানে না। কিন্তু কৌশল করিয়া যাহা পাইতে হয়, শোভনা তাহাকে ঘৃণা করিতেই শিখিয়াছে। তাই নারীর মোহিনী রূপকে শোভনা তাহার স্বভাবের মধ্যে বেশী প্রশ্রয় দেয় নাই।

শোভনা অতি সঙ্কোচের সঙ্গে বলিল, দিদি, তুমি আমার কাছে চল্লিশ টাকা পাবে।

সতী দেবী বাধা দিয়া কহিলেন, তুমি যখন পারো, দেবে। তার জন্য তুমি চিন্তা করো না।

শোভনা কহিল, কিন্তু ঋণতো শোধ দিতেই হবে।

সতী দেবী দুঃখিত হইয়া কহিলন, আমার কাছের ঋণতো

তোমাকে কোন দিন পীড়া দিতে চেষ্টা করবে না। তোমাকে ঐ ক'টা টাকা দিয়েছি বলতে পারলে খুসী হতাম। কিন্তু জানি যে, তা বললে তুমি খুসী হ'বে না। তাই তোমার যখন সুবিধে হয়, দিয়ো।

সতী দেবীর কথা শোভনাকে তৃপ্তি দিল। মানুষ মানুষকে এতো সহজে ভালবাসিতে পারে, এতো গভীরভাবে বিশ্বাস করিতে পারে, তাহা শোভনা ভাবিতে পারিত না। কিন্তু শোভনাকে ঋণ শোধ করিতেই হইবে, অথচ সতী দেবীকে ব্যথা দিবার শক্তি তাহার নাই।

শোভনা কহিল, দিদি, আমার তো আরও টাকার দরকার আছে। তাই তোমার কাছে এসেছি।

এই বলিয়া শোভনা তাহার একটা গলার নেকলেস বাহির করিল।

তারপর চাপা গলায় কহিল, যদি তুমি এটা আজকের দিনের মধ্যে আমাকে বিক্রি করে দাও! শুনেছি, এর দাম ছিল দেড়শ টাকা, আমি এখন পঁচাত্তর টাকা পেলেই খুসী! কারণ আমার টাকার দরকার।

কথাগুলি বলিয়া শোভনা মাথা নীচু করিয়া রহিল।

সতী দেবী বলিলেন, না বোন, আমি তোমাকে তোমার নেকলেস বিক্রী করতে দেবো না। আমার কাছ থেকে পঁচাত্তর টাকা ধার নেও, আমি আনন্দে তোমাকে দেব।

শোভনা চুপ করিয়াই রহিল।

সতী দেবী কহিলেন, নিজের গয়নাগুলো ছেড়ে একেবারে নিজেকে রিক্ত করো না। বিপদের সময় ওরা অনেক কাজ দেয়।

শোভনা বলিল, এখন তো আমার বিপদের সময়।

সতী দেবী হাসিয়া কহিলেন, এখনো তোমার স্বামী আছেন, দাদা আছেন, প্রয়োজন হলে তাঁরাই তোমার প্রয়োজন মেটাতে পারেন। কিন্তু মেয়েদের জীবনে এমন দিনও আসে যখন তোমার অর্থের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কাউকে পাবে না। সে-দিনের সম্বলকে এমন সহজভাবে হাত ছাড়া করো না।

শোভনা মলিন হাসি হাসিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করো সেদিন যেন বেঁচে না থাকি, কিন্তু আজকে স্বামীর প্রয়োজনে আমি নিজের গয়না বিক্রী করবো, আমার এতটুকু গ্লানি তাতে নেই। স্বামীর হাতে টাকা নেই জেনে, দিদি, তোমার কাছে এসেছি। আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না।

সতী দেবী শুধু কহিলেন, তোমার নেকলেস ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

শোভনা কাতর চোখে বলিল, দিদি, তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। যদি কোনদিন প্রয়োজন হয়, আমি তোমার দ্বারে এসে দাঁড়াব। কিন্তু এখনও আমার বাক্সে গয়না-গুলো আছে, তা থাকতে আমাকে স্বামীর জন্য ঋণ করতে বলো না। তা যে আমার পক্ষে অন্যায় হবে, সে অন্যায়ের ভার আমি সইতে পারবোনা।

সতী দেবী বুঝিলেন যে শোভানাকে সম্মত করানো সম্ভব হইবে না। স্বামীর জন্য সর্বস্ব উজাড় করিতে যাহারা প্রস্তুত, শোভনা তাহাদেরই একজন। তাহারা যুক্তি শোনে না, তর্ক করে না, নিজেদের রিক্ত করিয়া যায়। ফিরিয়া কি পাইল, তাকাইয়াও দেখিতে চাহে না। এই জাতের মেয়েদের বেশী বুঝাইতে গেলে গোলযোগ বাড়ে, তাই সতী দেবী আর দুই একবার অনুরোধ করিয়া শোভনার নেক্‌লেস বিক্রয় করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। একদিনের মধ্যে কাহাকে দিয়া এবং কি ভাবে বিক্রয় করিবেন, তাহা নিয়া শোভনাকে আর প্রশ্ন করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে, নিজেই নেক্‌লেসটা রাখিয়া শোভনাকে পঁচাত্তর টাকা দিয়া দিবেন। যদি কখনও সুযোগ পান, এই নেক্‌লেসটাও শোভনাকে ফিরাইয়া দিবেন।

সতী দেবী কহিলেন, তাহলে, তোমার নেক্‌লেসটা রেখে যাও, আমি স্যাকরা বাড়ীতে পাঠিয়ে বিক্রী করে আনবো। বিকেলের দিকে তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেবো।

শোভনা খুসী হইল। সে তাহার নেক্‌লেসটা সতী দেবীকে দিয়া কহিল, দিদি, তোমার কথা আমি চিরদিন মনে রাখবো। এই নেকলেস আমার বিয়ের জিনিষ, একে ছাড়তে যে আমার কষ্ট না হচ্ছে, তা' নয়। কিন্তু একে না ছেড়ে যে আমার উপায় নেই। আর, নেক্‌লেস আমি ব্যবহার করিনে। শুধু বাক্সে তোলা থাকার চেয়ে একটু কাজে আসুক।

সতী দেবী কোন কথা না বলিয়া নেক্‌লেসটী গ্রহণ করিলেন।

শোভনা তাহার সতীদি'র মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

অপরাহ্ণ বেলায় সতী দেবী চাকরের হাত দিয়া পঁচাত্তর টাকা' পাঠাইয়া দিলেন। শোভনা টাকাটা পাইয়া চল্লিশ টাকা লেপাফাতে মুড়িয়া ফিরাইয়া দিল। সতী দেবীর ঋণ শোধ করিবার জন্যই শোভনা তাহার নেক্‌লেসটা বিক্রয় করিয়াছে। এখন হাতে অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশ টাকা রহিল, তাহা দিয়া সে সংসারের অন্য সব ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যবহার করিবে।

অশোকের নিকট হইতে বিদায় নিয়া শোভনা বিমানের সঙ্গে শ্যামবাজার চলিয়া গেল। অশোক ট্যাক্সিতে শোভনাকে উঠাইয়া দিল। অশোককে মাঝে মাঝে শ্যামবাজারে তাহাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য বিমান নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। শোভনা একবার অশোকের দিকে তাকাইল।

শোভনা চলিয়া যাইবার পর অশোকের যেন মনে হইল যে তাহার আর কোন কাজ নাই। কাজ থাকিলে কাজকে ফাঁকি দিয়া মানুষ আনন্দ পায়, কিন্তু কাজ না থাকিলে দিন রাত্রের অলস ঘণ্টাগুলি মানুষকে ব্যথা দেয় সবচেয়ে বেশী। শোভনা চলিয়া যাইবার পর অশোক তাহার ঘরে গিয়া নির্জ্জনতা বোধ করিল। আগামী কাল সে এই ফ্ল্যাট ত্যাগ করিয়া মেসে চলিয়া যাইবে। এইটা ভাবিতে তাহার একটু কষ্ট হইল। এই বৃহৎ বাড়ীতে তাহার কোথাও মমতা ছিল না। অথচ যেখানে সে এতদিন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহা ছাড়িতেও কষ্টবোধ হইল।

তবুও তাহার ছাড়িতে হইবে—গৃহ ছাড়িয়া তাহাকে মেসে বাসস্থান রচনা করিতে হইবে। এই নিভৃত নির্জ্জন ঘরে বসিয়া তাহার অবসন্ন চিত্তের প্রাঙ্গণে মাধুরীর ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া দেখা দিল। মাধুরীর কথা হঠাৎ মনে পড়াতে অশোকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। দরজার তালা বন্ধ করিয়া সে মাধুরীদের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

বাড়ীর ফটকে ঢুকিয়াই দেখিল যে, মাধুরীর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। অশোক দোতালায় উঠিয়া গেল, কারণ সেই বাড়ীতে তাহার অবাধ গতি ছিল। সিঁড়িতে শব্দ শুনিয়া মাধুরী অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। অশোক ঘরে ঢুকিতেই মাধুরী হাসিয়া ফেলিল।

অশোক কহিল, তোমার পড়ার ব্যাঘাত ঘটল।

মাধুরী হাসিয়া কহিল, ব্যাঘাত নিশ্চয়ই ঘটল কিন্তু ক্ষতি হ'লো না, কারণ আমি একখানা গল্পের বই পড়ছিলুম।

—তোমার হঠাৎ এই রসসাহিত্যের দিকে ঝোঁক গেল কেন? তোমাদের অবলম্বন করেই তো সাহিত্য গড়ে উঠছে।

—দেখ্‌চি, আমরা লেখককে কতটা অভিভূত করতে পেরেছি। আচ্ছা, অশোকদা, তোমরা আমাদের এতো চাটুকারিতা করো কেন? তোমরা কি ভাব যে শুধু প্রশংসার বাণীতে আমাদের জয় করা যায়?

—হয়তো পারা যায় না। কিন্তু বাণীর সাহায্যে হৃদয়ের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছানো যায়। দেবীকে লুণ্ঠন করতে অন্য শক্তি

দরকার, তা' আমরা জানি। আমাদের তৃপ্তি যে তোমাদের হৃদয়ে দাগ কেটেছি, তোমাদের হৃদয়ের দীপ জালিয়ে দিয়েছি, তোমাদের চেতনা দিয়েছি। দস্যুবৃত্তি সাহিত্যিকের কাজ নয়।

—তার মানে, তোমরা দুর্ব্বল।

—যে অত্যাচারী নয়, সে দুর্ব্বল, একথা আমরা স্বীকার করিনে।

মাধুরী ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, আমাদের অভিধানে অর্থ কিন্তু আলাদা। আমরা জানি যে পুরুষের শক্তি প্রকাশ পায় অত্যাচারে এবং যার শক্তি নেই, সে-ই দুর্ব্বল।

অশোক উত্তর দিল, আমরা জানি যে দুর্ব্বল, সে-ই অন্যায় করতে সাহস করে। যে শক্তিহীন, সে-ই পরের উপর অত্যাচার করে।

মাধুরী চোখ বুজিয়া বলিল, তোমরা জানো যে মেয়েরা কড়া স্বামী ভালবাসে, তাই সাহিত্যিকদের স্বামী বলে গ্রহণ করতে মেয়েদের এতো দ্বিধা।

অশোক বিদ্রূপ করিয়া কহিল, মেয়েরা কি ভালবাসে একথাই যদি মেয়েরা জানতো বা বুঝতো, আমাদের পথ অনেক সহজ হ'য়ে উঠতো। কিন্তু রামধনুর মত সাতরঙে মেয়েরা আঁকা —কার মধ্যে কোন্ রঙ উজ্জলতর, সে-কথা আমরা জানিনে, তোমরাও জানোনা। তাই তোমাদের মন ওঠে না—আমরা শান্তি পাইনে। তোমাদের মনের রঙ কখন কোন্ শিল্পীর তুলিতে ধূসর বা উজ্জল হবে, সে-তথ্যের অন্ধ গলিতে পুরুষ

পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পথ তারা পায়না, কারণ কোন পথই সেখানে নেই।

মাধুরী গম্ভীর হইয়া কহিল, আমরা কি তোমাদের চিরকাল পথ-হারা করি, পথের সন্ধান দিইনে—এই তোমাদের বিশ্বাস ?

অশোক নিজের মাথার চুলের উপরে আলগোছে আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া কহিল, পুরুষ তোমাদের কাছে নতজানু হ'য়ে এই ভিক্ষাই চাইছে যে তোমাদের উপর তাদের বিশ্বাস যেন না হারায়, তোমরা যেন তাদের পথের সন্ধান দাও। মধু, আমাদের জীবনের পথ সরীসৃপের মত পিচ্ছিল ও সরু, তাই তোমরা অনায়াসে আমাদের বিপথগামী করতে পারো।

মাধুরী আলোচনার মোড় ফিরাইয়া দিল। সে হাসিয়া কহিল, বাবা এবার সি, আই, ই, উপাধি পাবেন, তা তুমি জানো ?

—সি, আই, ই ? হাঁ, তা তো আরও পূর্ব্বেই পাওয়া উচিত্ত ছিল।

—তুমি এসব উপাধির কিছু অর্থ-ই বোঝ না। সি, আই, ই, কি এতো সহজেই পাওয়া যায় !

—অনেক হাঙ্গামা আছে জানি কিন্তু সেই বিলাসের অর্থ এবং সময় দুই-ই তোমাদের আছে।

—"তোমাদের" মানে ? সি, আই, ই, কি আমি পেতে যাচ্ছি ?

—পেলে মন্দ হয় কি ! মিস্ মাধুরী বোস্, সি, আই, ই, বলে অভিহিত হবে।

—অনাবশ্যক অক্ষরে আমার প্রয়োজন নেই।

—কিন্তু এই অনাবশ্যকের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে কত আবশ্যকীয় ব্যাপার নীচে তলিয়ে যায়, তার হিসেব ত কেউ রাখে না, রাখবার প্রয়োজনও হয় না।

মাধুরী চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোনদিন স্কুলে প্রাইজ পেয়েছ? প্রাইজকে পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করতে পারো, অথচ সরকারের দেওয়া উপাধির প্রতি তোমাদের এতো আক্রোশ কেন? তা'ও তো পুরস্কারেরই অন্য এক রূপ মাত্র।

অশোক হাসিয়া কহিল, থাক, এ আলোচনা বন্ধ করাই ভালো। পুরস্কার চিরকাল সম্মানের জিনিষ। কিন্তু দেশবাসী-দ্বারা যারা তিরস্কৃত হ'ন, সরকার তাদের পুরস্কৃত করেন, তাই তথাকথিত সম্মানের উপাধিগুলি আমাদের পীড়া দেয়। সরকার ও দেশবাসীর মানদণ্ডের মধ্যে এই পার্থক্য না থাকলে কোন বিরোধই সৃষ্টি হ'তোনা।

—কিন্তু তুমি জানো যে, বাবা এই নতুন সম্মান পাবার জন্য মেডিকেল কলেজে ত্রিশ হাজার টাকা দান করতে প্রস্তুত হ'য়েছেন। এই দানের সঙ্গে কি দেশের কোন সংযোগ নেই?

—দাতা চিরকালই মহৎ কিন্তু এ দানতো দেশের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ করতে পারেনা। তার দান যে-প্রতিষ্ঠানকে বাড়িয়ে দেবে, সেখানে ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্রের স্থান নেই। আমি সেই ব্যাধিগ্রস্তদের বাঁচতে দেখতে চাই।

মাধুরী হাসিয়া বলিল, কিন্তু তাদের বাঁচাতে হ'লেও ত এই দানকে ও প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করতে পারবে না। দেশের আর্ত্তনাদকে তুমি ফাঁকা কথায় শান্ত করতে পারবে না। ক্ষুধায় যারা অবসন্ন, তারা বেশীদিন চুপ করে থাকবে না।

অশোক কহিল, তোমাদের দৃষ্টি ব্যক্তিগত, আমাদের দৃষ্টি সমাজগত। তোমরা ব্যক্তির দানকে বড় করে দেখো, কারণ ব্যক্তিকে তোমরা ভুলতে পারোনা, আমরা সমাজকে বড় করে দেখি বলে কোন বিশেষ ব্যক্তির দানের ঔদ্ধত্যকে হজম করতে পারিনা। আমরা জানি যে, সমাজকে ফাঁকি না দিতে পারলে ব্যক্তিবিশেষ মহৎ দানশীল হ'তে পারেনা। তাই সমাজের ভিতর যে-জিনিষ বিস্তৃত দেখতে চাই, তা' ব্যক্তিবিশেষের হাতে গচ্ছিত দেখলে আমরা ক্ষুব্ধ হই।

মাধুরী তাহার সুন্দর গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া বলিল, ব্যক্তিকে অস্বীকার করে তোমাদের সমাজের পরিকল্পনা আমি প্রশংসা করতে পারলেম না। তুমি জানো যে, মানুষের উপার্জ্জনের পেছনে থাকে তার অধ্যবসায়, তার শক্তি। সে যখন দানের সাহায্যে মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করতে চায়, দেশের মঙ্গলকে বরণ করতে চায়—সে তখনই ধন্য হয়। এই যে মানুষের সঙ্গে নীরব ও গভীর মিলন, এই যে কল্যাণের সঙ্গে মানুষের সংযোগের চেষ্টা, তা সমাজগত বিধিব্যবস্থায় সম্ভব নয়। মানুষকে ছোট করে যারা সমাজকে বড় করে দেখে, আমি তাদের দলে নই।

অশোক ধীরে ধীরে বলিল, মানুষ একা, সমাজ দশের।

আমরা দশের মঙ্গল চাই—তাই দশের আধিপত্যে বিশ্বাস করি। মানুষ দশের মঙ্গলের জন্য খাটবে, নিজের জন্য নয়।

মাধুরী কহিল, তুমি জানো যে, মানুষ নিজেকে না চিনলে বহুর সঙ্গে মিলতে পারেনা। তাই নিজেকে চেনবার সুযোগ দিতে হ'বে।

—এই সুযোগ দিতে গিয়ে দেখা গেছে যে, অনেকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই বঞ্চনার দিকটা আমাদের এতো সতর্ক করে দিয়েছে।

মাধুরী ব্যথিতস্বরে কহিল, তুমি জানোনা, অশোকদা, যে মেয়েরা নিজেদের ভুলতে পারেনা-পারবেওনা। ফ্যাক্টরিতে মানুষ গড়া যায় না। মানুষতো তোমাদের কাঁচা মাল নয় যে সমানভাবে গড়ে-পিটে নেওয়া যায়।

অশোক আর মাধুরীকে ব্যথা দিতে চাহিল না। তাই তর্কের স্রোতকে অন্যদিকে প্রবাহিত করিয়া দিল। সে শুধু হাসিয়া কহিল, আমার কথা দেশবাসীকে বোঝাতে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করতে হবে।

মাধুরী খুসী হইল। সে বলিল, তুমিতো তোমার গল্পের ভিতরও এসব কথা বলতে চেয়েছ। তোমার ছোটগল্পের একখানা বই বের করোনা।

অশোক কহিল, গল্প লিখেছি বটে কিন্তু তা' মাসিক ও সাপ্তাহিকের দপ্তর থেকে খুঁজে বের করতে যে-শ্রম ও সময় লাগবে, তা' আপাততঃ আমার নেই।

মাধুরীর চোখ দুষ্টু হাসিতে ভরিয়া উঠিল। সে শুধু বলিল, বিশ্বাস থাকলে সে ভার আমার উপর দাও।

অশোক চোখ চাহিয়া কহিল, তুমি! তুমি ওসব গল্প কোথায় পাবে! হঠাৎ আকাশে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—বিদ্যুৎশিখা যেন আলোকিত কক্ষে আসিয়া তাহাই জানাইয়া দিয়া গেল। অশোক মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, যাই, মধু, এক্ষুনি জল পড়বে।

মাধুরী চকিতভাবে বলিল, তোমার ছাতা নেই ?

অশোক হাসিয়া কহিল, বর্ষায় কোন অবলম্বনকেই বিশ্বাস করিনে।

এই বলিয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিল। মাধুরী পাশের ঘর হইতে তাহার নিজের ওয়াটারপ্রুফ আনিয়া দিয়া কহিল, আমার এই ক্ষুদ্র বর্ষাতি তোমার দেহকে আবৃত করতে না পারলেও বাইরের বর্ষণ থেকে কিছু রক্ষা করতে পারবে।

অশোক হাসিল—একবার গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল কিন্তু আপত্তি জানাইলে মাধুরী অখুসী হইবে, ইহা ভাবিয়া ডান কাঁধের উপর বর্ষাতি ফেলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

মাধুরী জানালা দিয়া অশোককে লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিল, বাইরের অন্ধকারে অশোকের গতি অনুধাবন করিতে পারিল না।

ছয়

অশোক রসারোডের এক নতুন মেসে আসিয়াছে। দোতালায় এক কোণে একটি ছোটঘর। একাই সে ঘরে অশোক থাকে। ঘরে একটি দরজা ও একটি জানালা। জানালা খোলা থাকে কিন্তু দরজা সবসময় বন্ধ থাকে। সেই মেসের অধিবাসীরা মার্কেণ্ট আপিস, ব্যাঙ্ক, ইন্সুরেন্স ইত্যাদি নানাস্থানে কাজ করে। এদের সঙ্গে অশোকের যোগসূত্র কম, তাই কোন যোগসূত্র সে গাঁথিতেও চায়না।

সেদিন দুপুরবেলা অশোক ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ আপিস হইতে পিয়ন চিঠি লইয়া আসিল। চিঠি খুলিয়া দেখিল যে সম্পাদক মহাশয় তাহাকে তৎক্ষণাৎ আপিসে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। পিয়নকে বিদায় দিয়া সে আবার বিছানায় আসিয়া শুইল। জানালা দিয়া একবার বাইরের আকাশের দিকে তাকাইল—রৌদ্রের প্রখরতা তখনও কমে নাই, দুপুরের নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া তখনও চতুর্দ্দিকে কলরব আরম্ভ হয় নাই। যাহারা রাত্রে কাজ করে এবং স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া

দিয়াছে, তাহারাই শুধু জানে যে, এই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ দুপুর কতখানি মূল্যবান। কিন্তু তাহার সম্পাদকের আদেশ পালন করিতে হইবে। হয়তো, অনেক কিছু শুনিবার আছে, অনেক কাজ করিবার আছে এবং তাহারই প্রয়োজন সে-সব কাজে সম্পাদক অনুভব করিয়াছে বেশী। অথবা, কাগজ সম্বন্ধে নতুন কিছু করিতে হইবে এবং সে-সব কাজ তাহাকে বাদ দিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। রাত্রির সম্পাদকের সহযোগিতা না পাইলে দৈনিক কাগজে কিছু পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। আবার মনে হইল, কাগজে হয়তো কোন কিছু ভুল আছে যাহার জন্য সম্পাদক তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন। অশোক একমাত্র সান্ত্বনা অনুভব করিল যে, সম্পাদক রাত্রির কাজের কোন খবরই রাখেন না এবং কোন খবরই বুঝেন না।- রাজনৈতিক কাগজের সম্পাদকের কাগজের কাজ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকিলেও চলে। কাগজের মালিকদের দাক্ষিণ্যপূর্ণ দৃষ্টি যতদিন থাকিবে, ততদিন সম্পাদকের পদ হইতে সম্পাদককে চ্যুত করিতে কেহ পারিবে না। সংবাদপত্রের কাজ যাহারা জানিবেন, তাহাদের নীচের দিকেই থাকিয়া যাইতে হইবে, কারণ তাহাদের কর্ম্ম-দক্ষতাকে শোষণ করিয়াই কাগজ ও সম্পাদকের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের দেশে সংবাদপত্রে কাজ জানা নিজের উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটায়। কাজ না জানিলে হয়তো উপরের দিকে উঠিয়া যাওয়া যায়, কারণ তাদের কোন কাজ দিয়াই নির্ভর করা যায় না।

অশোক অনেক কিছু ভাবিল কিন্তু কোন সীমানা পাইল না। সে মুখটা নিজের বস্ত্র দিয়া মুছিয়া গায়ে পাঞ্জাবী দিয়া এবং স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়া রওনা হইল। মাথার চুল অসংলগ্নই রহিল, অশোকের তাহাতে কোন ভ্রূক্ষেপই থাকে না।

অশোক যখন আপিসে আসিল, তখন দিনের কাজ পুরাদমে চলিতেছে। আপিসে ঢুকিয়া সে নিউজ-এডিটারের টেবিলে গিয়া বসিল। সুশীল নিউজ-এডিটার—তাহার বিশেষ বন্ধু। কিন্তু আজ অশোককে দেখিয়া সে গম্ভীর হইয়া রহিল। শুধু শান্তস্বরে বলিল, তোমাকে এডিটার ডেকেছেন।

অশোক একটু হাসিল। ভাবিল যে, ডাকিবার হেতু জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু সুশীলের অহেতুক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া এডিটারের ঘরে গেল।

এডিটার অশোককে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, বসুন।

অশোক চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। এডিটারকে চুপ থাকিতে দেখিয়া অশোক দৃঢ়ভাবে বলিল, আপনি ডেকেছিলেন, তাই এসেছি।

এডিটার বলিল, হাঁ, আপনাকে ডেকেছিলাম। বিশেষ কোন কারণে নয়, কিন্তু আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার আপনার উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কালকে কলকাতায় দশটা বিদেশী দ্রব্যের বয়কট মিটিং হয়েছিল, তা' আপনি লোকাল পেজে খুব সাধারণভাবে ছেপেছেন। টেলিগ্রাম পেজে তিন কলম হেড্-লাইন দিয়ে ছাপানো উচিত ছিল। আপনার ব্যক্তিগত

মত যা-ই থাকুক, কাগজের মতকে আপনার অনুসরণ করা উচিত।

অশোকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতের সহিত কাগজের মতের গরমিল আছে, তাহা সম্পাদক মহাশয় জানিতেন। অশোককে সম্পাদক একটু ভয় করিতেন, কারণ সে কাজ জানে এবং সুশিক্ষিত।

অশোক গম্ভীর হইয়া বলিল, আপনার বা নিউজ-এডিটারের বলে যাওয়া উচিত ছিল। যে-কাগজের অর্দ্ধেক আয় বিদেশী ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনে, সে-কাগজে বয়কট মিটিং টেলিগ্রাম পেজে যাবে কি-না, তা' জানাতো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এডিটার বলিলেন, একথা না বললেও আপনার জানা দরকার। কাগজের পলিসি জানা আপনার কাজের অঙ্গ। তা' না জানলে, আপনাদের ভুগতে হবে।

অশোক সহজভাবে বলিল, যে-কৌশল জানলে সংসারে ভুগতে হয় না, তা' আমার জানা নেই। স্বদেশী নেতার অধীনে স্বদেশী কাগজে কাজ করলে কতটা পরিমাণ ভুগতে হবে, তা' অবশ্য জানিনে কিন্তু না ভুগেও যে উপায় নেই, তা' এই ক'দিন কাজ করে বুঝতে পেরেছি। তাই ভুগতে হবে জেনে আমাদের ভয় নেই।

এডিটার একটু অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে খুসী করতে না পারলে আপনাকে অনেক কিছু ভুগতে হবে। আমি চেষ্টা করলেও আপনাকে বাঁচাতে পারবো না।

এডিটার এমনই একটা ভাব দেখাইল যে, তিনি অশোককে বাঁচাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হন নাই।

অশোক কিছুই বুঝিতে পারিল না, কারণ ম্যানেজিং ডিরেক্টার কি কহিয়াছেন, কি শাস্তি বিধান করিয়াছেন, অশোক তাহা জানিতে পারে নাই।

এডিটার গম্ভীরভাবে কহিলেন, আপনি নিউজ-এডিটারের কাছে যান, তাঁর কাছে সব কথাই শুনতে পাবেন।

অশোক কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। এডিটারের উপর তাহার শ্রদ্ধা নাই, তাই সে তাহাকে এড়াইয়া চলে। এডিটার দল গড়িতে জানে, তাই তাহার আপিসে প্রতিপত্তি; এডিটার খোসামদ করিতে জানে, তাই ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে সে প্রিয়; তার স্বভাব অনুদার ও পরশ্রী-কাতর, তাই দলাদলিকে সে ভালবাসে। আপিসে একটী এডিটারের দল আছে, তাতে নিউজ-এডিটার এবং একজন এসিষ্টাণ্ট এডিটার সমস্ত সংবাদ দেন, জটলা করেন এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টারের মনকে বিষাক্ত করেন। এডিটার তার দলের কথা শোনেন এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার এডিটারের কথা শোনেন। এইভাবেই আপিসের শাসন চলে, কর্ম্মচারীদের শাস্তি বিধান চলে। এসিষ্টাণ্ট এডিটার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের আত্মীয়, তাহার কাছেও ম্যানেজিং ডিরেক্টার অনেক কিছু শোনেন, অনেক কিছু মন্তব্য পাশ করেন, সে-সব মন্তব্য এসিষ্টাণ্ট এডিটার বন্ধুভাবে

কর্ম্মচারীদের জানাইয়া দেন এবং প্রয়োজন হইলে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে কাহারও বিরুদ্ধে শক্রতা সাধন করেন।

অশোক আপিসের ষড়যন্ত্রের কথা জানিত এবং এডিটারের দলবলকে ঘৃণা করিত। সে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইত যে, ইহারাই দেশবাসীকে দেশসেবা করিতে উপদেশ দেন এবং দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা করেন। এ যেন দেশপ্রেমের সাধনার মন্দিরে পাণ্ডার অত্যাচার ও ব্যভিচার; মন্দিরের জাগ্রত দেবতা পর্য্যন্ত কেহই পৌঁছিতে পারে না।

অশোক নিউজ-এডিটারের কাছে একটা চৌকিতে বসিল। সুশীল একটা চিঠি পড়িতে পড়িতে বলিল, সব শুনেছ?

অশোক একটু হাসিয়া কহিল, শোনবার জন্যে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সুশীল কহিল, তোমার আর রাত্রে কাজ করতে হবে না। বিকেল বেলায় লোকাল সংবাদ ও কোর্টের সংবাদের চার্জ্জে থাকতে হ'বে।

অশোক ভাবিল যে ভালই হইল, কারণ রাত্রে আর জাগিতে হইবে না। খবরের কাগজের আপিসে প্রয়োজনীয় গুরুতর কাজের ভার অপসরণ করিয়া লওয়ার মানে হইল তাহাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া। রাত্রির দায়িত্বপূর্ণ কাজ হইতে সরাইয়া লইয়া অশোককে শুধু সভা-সমিতি ও কোর্টের সংবাদ সম্পাদনার ভার দিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টার যে-শাস্তি দিতে চাহিলেন, অশোক তাহা সানন্দে গ্রহণ করিল। অশোক তাহার

নিজের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ, তাহাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতে বঞ্চিত করিলেই যে সে শক্তিহীনের দলে গিয়া পড়িবে, এমন বিশ্বাস তাহার নাই। একথা অবশ্য সত্য যে, হাতে শক্তি থাকিলে ক্ষমতাও বাড়ে বেশী, কিন্তু ক্ষমতার লোভে অশোক নিজেকে বিকাইতে প্রস্তুত নয়।

অশোক বলিল, আমার মাইনে না কমিয়ে ক্ষমতা অপসরণ করে যদি ম্যানেজিং ডিরেক্টার আমাকে শাস্তি দিতে চান, সে-শাস্তি আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করলাম। দিনের বেলায় যে-কোন অপ্রয়োজনীয় কাজে আমাকে নিযুক্ত করো না কেন, আমার কোন আপত্তি নেই।

সুশীল সান্ত্বনা দিবার সুরে বলিল, তুমি ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে একবার দেখা করো না কেন? অসাক্ষাতে যে-সব গরমিল বাড়ে, দেখা হ'লে সে-সব চুকে যায়। তার জন্যই আমি বরাবর মালিকের সঙ্গে সংযোগ রাখতে বলেছি।

অশোক বলিল, যারা পরের কথায় শাস্তিবিধান করে, তাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে গেলে নিজেকে হীন করে ফেলতে হয়। মানুষের বিচার যেখানে চলে খোসামুদিতে, গুণে নয়, সেখানে আমাকে তুমি পাবেনা।

সুশীল অশোকের খোঁটায় বিদ্ধ হইল। ভাবিল, অশোককে কড়া কথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু সুশীল নিজেকে কখনও ধরা দিতে চায় না—ছদ্মবেশে চলিতে তাহার একটা স্বাভাবিক নিপুণতা আছে এবং তাহাতে সে আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করে।

সুশীল শুধু বলিল, নিজের জন্য মালিকের কাছে অনুগ্রহ চাইলে যে হীনতা প্রকাশ পায়, এ আমি বিশ্বাস করি না। একজনের কাছে মাথা নীচু করে দশজনের সঙ্গে সমানভালে চলতে পারা কি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করো না?

অশোক হাসিল। সে বলিল, গর্ব্বিত বিত্তশালী লোকদের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে নেই। অনুগ্রহের সাহায্যে যা' পাওয়া যায়, তা রাখতে হ'লে চিরকাল অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। চিরকাল করজোড়ে নত-মস্তকে থাকবার মানসিক বৃত্তি আমার নেই। ভিক্ষা না চাইলে যে ভিক্ষা দিতে অনভ্যস্ত ও অনিচ্ছুক, সেই গৃহস্থকে সর্ব্বদা খুসী রাখা যে কি বিষম দায়, তা' কি তুমি জানোনা?

সুশীল চুপ করিয়া রহিল।

অশোক স্তব্ধতা ভাঙিয়া বলিল, আমি কবে থেকে বিকেলে আসব?

সুশীল কহিল, কাল থেকে।

—রাত্রে কে কাজ করেবে?

—তা'র একটা বন্দোবস্ত হবে।

বলিয়াই সুশীল ঘণ্টা বাজাইয়া বেহারাকে বলিল প্রিণ্টারকে ডাকিয়া আনিতে।

অশোক নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। পাশের টেবিল হইতে খগেন বলিল, অশোক, আমিও যাবো।

অশোক বলিল, তোমার ডাকএডিশন সব হয়ে গেছে?

খগেন চোখের ইসারায় তাহাকে চুপ করিতে জানাইল।

কিছুক্ষণ পরে অশোক ও খগেন বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় বাহির হইয়া খগেন বলিল, তুমি বোকা। তোমাকে রাতের কাজ থেকে সরিয়ে দেবার কারণ তোমার কোন কাজের ক্রটি নয়। কুন্তলা দেবীর নিজের লোককে বসানো হ'লো উদ্দেশ্য।

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তাহ'লে যিনি আসছেন, তিনি কুন্তলা দেবীর আত্মীয়!

কুন্তলা দেবী ম্যানেজিং ডিরেক্টারের স্ত্রী।

খগেন বলিল, না তিনি দেবীর আত্মীয় নন, তিনি দেবীর পার্টির একজন প্রধান কর্ম্মী। বয়স অল্প, দেখতে সুন্দর এবং তদুপরি পার্টির লোক।

কুন্তলা দেবীকে বুঝাইতে হইলে ক্রনিকল অপিসের কর্ম্মচারী-গণ সংক্ষেপে "দেবী" বলিত। নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় তাতে সুবিধা হইত।

অশোক বলিল, দেবীর আবার কিসের পার্টি? আমরা তো জানি যে তার স্বামীরই পার্টি।

খগেন হাসিয়া বলিল, তুমি কিছুই জানোনা। চলো, একটা চায়ের দোকানে ঢুকি, তারপর সব শুনবে।

চায়ের দোকানের একটি ছোট্ট ঘরে গিয়া তাহারা বসিল। দুই কাপ চা আনিতে বলিয়া খগেন অশোককে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি হাত দেখতে জানো? অথবা কুষ্ঠি বিচার? তাহ'লে তোমারও বরাত খুলবে।

অশোক সবিস্ময়ে বলিল, পরের হাত দেখলে বা কুষ্ঠি বিচার করলে নিজের বরাত খুলবে, এ খবর তুমি কোথায় পেলে?

খগেন বলিল, এ সংসারে কার বরাত কখন চাপা পড়ে বা খুলে যায়, তা' কে বলতে পারে! আমিত ভাই ভাগ্য মানি। কতকগুলি লোক ভাগ্যবান, কারণ তারা কর্ম্মের জোরে নয়, বরাতের জোরে এগিয়ে যায়। তুমি ভাগ্য-দেবতার লুক্কায়িত শক্তিকে বিশ্বাস করো?

অশোক বলিল, বিশ্বাস করি না, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দেবী সম্বন্ধে তোমার কাহিনী চাপা পড়লো।

খগেন বলিল, বলছিলাম যে হাত দেখতে জানলে তুমি কুন্তলা দেবীর প্রিয় হ'তে পারো। শুনেছি, তিনি না-কি হাতের রেখা মেনে কাজে অগ্রসর হন এবং স্বামীর আর্থিক উন্নতির জন্য যে-কোন বিধান তিনি পালন করতে প্রস্তুত। অবশ্য তিনি এই আর্থিক চিন্তার ভিতর পরমার্থ চিন্তাকে বাদ দিয়ে চলেন। এবং আমাদের আপিসে নাইট-এডিটার যিনি হ'লেন, তিনি না-কি ভাল কুষ্ঠি বিচার করতে পারেন। কুষ্ঠী বিচার করে তিনি ম্যানেজিং এডিটারের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল বলে প্রচার করেছেন এবং তাই তিনি এতো প্রিয়। তার কথামত কিসের যজ্ঞও না-কি দেবী সম্পন্ন করেছেন, তাতে অর্থ আসবে প্রচুর এবং নেতৃত্বের রথ চলবে অপ্রতিহতভাবে।

অশোক হাসিয়া বলিল, ওদের এতো নেতৃত্বের লোভ কেন?

দেশের শক্তি ও বিত্তকে যাঁরা বাড়াতে সক্ষম, নেতা হবেন তাঁরা। নিজের বিত্তের দিকে যাঁদের সজাগ দৃষ্টি, শক্তি অর্জ্জন না করে যাঁরা অধিকারী হতে যান, তাঁদের নেতৃত্বের ভারে দেশ অবনত হয়ে পড়ে, দেশের উজ্জ্বলতা তাতে বাড়ে না।

খগেন বলিল, দেশের নামে নিজেকে যে প্রচার করতে পারে, দেশসেবা আমরা তাকেই বলি। দেশনেতা হ'তে হলে যেদিন নিজের সেবা না করে দেশের সেবা করতে হবে, নেতৃত্বের মোহ সেদিন ভাঙবে এবং নেতার আসরে সেদিন এসব গর্ব্বিত বিত্তশালী লোকদের খুঁজে পাবে না। এই নেতৃত্বের গাঁথুনী পোক্ত করার জন্য কুন্তলা দেবী তাঁর স্বামীকে প্রচুরভাবে সাহায্য করেন, সে-কথাটাই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম।

অশোক কহিল, দেবী স্ত্রীর কাজই করছেন। স্বামীকে সাহায্য করা অবশ্য স্ত্রীর কাজ।

খগেন বলিল, স্ত্রীর কাজ অবশ্য করছেন, কিন্তু স্ত্রী-ধর্ম্ম পালন করছেন কি-না, সে-তর্কের ভিতর আজ যাবো না।

অশোক বলিল, তার মানে ?

খগেন বলিল, তুমি জানো না যে, দেবীর একটি সঙ্ঘ আছে, তার সভ্য স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে হ'তে পারে। সেই সঙ্ঘের বৈঠক দেবীর বাড়ীতেই হয়—সাধারণতঃ রাত্রিতে বৈঠক বসে। সেই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বিরুদ্ধ দলের সঙ্ঘকে ভেঙে দেওয়া এবং বিরুদ্ধ দলের রাজনৈতিক কর্ম্মীদের প্রলুব্ধ ক'রে জয় করা।

অশোক কহিল, জয় করাতে অপরাধ নেই, কিন্তু প্রলোভনের ব্যাপারটা কি?

খগেন হাসিয়া কহিল, কোন কর্ম্মীকে জয় করতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন মহিলা সভ্য রাখা। তুমি জানো বাংলা দেশে নারী-কর্ম্মীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অনেক দরিদ্র কলেজ-ছাত্রীদের এসব সঙ্ঘে সভ্য করা হয়, তারা অর্থসাহায্য পায় এবং তাদেরই সাহায্যে বিরুদ্ধ দলের কর্ম্মীদের ভোলান হয়। তুমি যদি দেবীর সঙ্ঘের সভ্য হও, মেয়ে-সভ্যদের সঙ্গে অবাধে মিশতে পারবে এবং তাদের সাহায্যে বিপক্ষ নেতাদের সঙ্ঘ ভাঙতে পারবে। এই ভাবে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ছিনিমিনি খেলা চলে, দলাদলি চলে, দলের ভাঙন ধরে, নারীশক্তির জাগরণ হয়, কত লোকের গৃহ ভাঙে এবং কত কর্ম্মী এই নারী-সভ্য বিরচিত মোহের পাঁকে ডুবে যায়—তাহাদের খোঁজও পাওয়া যায় না।

অশোক বলিল, তুমি এসব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস কার কাছে থেকে সংগ্রহ করেছ? দেবী নিজে নারী হ'য়ে নারী-সভ্যদের এই হীনভাবে ব্যবহার করতে পারেন! তার মানে তিনি নিজের মর্য্যাদা নিজেই নষ্ট করছেন। এই সব খেলার আঁচর তো তাঁর গায়েও লাগবে।

খগেন হাসিয়া কহিল, তোমার বিশ্বাস যে দেবী আঁচরকে ভয় করেন? তিনিই তো তাঁর সঙ্ঘের মক্ষিরাণী—তারই সৌরভে যুবক-কর্ম্মীর ভিড় এবং তারই অর্থে নারীকর্ম্মীর অভাব

হয়না। দেশসেবার গৌরবময় পথে নিজের দেহসম্বন্ধে সচেতন থাকা দেবী ও তাঁর সঙ্ঘের সভ্যরা বিশ্বাস করেন না। দেশসেবায় যাঁরা নেবেছেন, দশকে ভুলানোও যে তাদের কাজের অঙ্গ।

অশোক বলিল, তোমার ব্যাখ্যা চমৎকার এবং কল্পনাকেও তারিফ করতে হয়। তুমি কি দেবীর সঙ্ঘের লোভেই দেশ-সেবায় নেবেছ না-কি ?

খগেন কহিল, না ভাই, সবার বরাত সমান নয়। তাই-বলছিলাম যে ভাগ্যে বিশ্বাস করি। তুমি একবার সেই পথে বরাত চেষ্টা করোনা—অবশ্য তোমার স্ত্রীর প্রতি অবিচার করোনা।

অশোক একটু হাসিয়া কহিল, সেই পথের যারা খোঁজ পেয়েছে, তাদের ভিড় ঠেলে কি আমরা এগুতে পারবো ?

অশোক খগেনের দিকে চোখ চাহিয়া কহিল, তুমি এসব খবর পেলে কোথায় ? নেতৃত্বের কি সত্যিই এত মোহ যে একে রাখতে হলে এতো বিধি-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে ?

খগেন গম্ভীর হইয়া কহিল, মোহমুগ্ধ যারা না হয়েছে তারা এসব কথা বিশ্বাস করবেনা। আমি ও প্রথমটা করিনি, কিন্তু এখন করি।

অশোকের মনটা মুষড়াইয়া গেল। সে এতোটা ভাবে নাই এবং এতোটা বিশ্বাসও করিতে পারেনা। মানুষ প্রয়োজ-নের দাস, একথা সে জানে ; কিন্তু নিজের প্রয়োজনের খাতিরে

মানুষ নিজেকে বলি দিতে পারে, সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের বিরুদ্ধে তাহার প্রচুর অভিযোগ আছে কিন্তু নেতা ও কর্ম্মীদের যোগ-সেতু যে কুন্তলাদেবী, একথা সে ভাবিতে পারে নাই। অশোক খগেনকে বিশ্বাস করিলনা কিন্তু কোন বিরুদ্ধ কথাও বলিলনা, পাছে খগেন তাহার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করিয়া দেয়। অশোক সত্যকে চোখ চাহিয়া দেখিতে কখনও ভয় করে নাই কিন্তু আজ সে পারিলনা। বিত্তশালী অহঙ্কারী নেতাদের সে অবজ্ঞা করে, কিন্তু আজ তাহাদের পরিবারের কলঙ্কবার্ত্তা সে বিশ্বাস করিতে চাহিলনা।

তাই শুধু অশোক বলিল, আজ যাই, আবার রাত্রে আপিসে আসতে হবে। কাল থেকে দিনে আসব, অন্য সব কথা হবে।

খগেনও চৌকি ছাড়িয়া উঠিল।

যখন তাহারা চায়ের দোকান হইতে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। খগেনকে "গুড্ নাইট" বলিয়া অশোক কালীঘাটের ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

সাত

ট্রামে উঠিয়া অশোক স্থির করিল যে, সে একবার হরিশ মুখার্জ্জির আড্ডাতে যাইবে। দিনের কাজ পাইয়া সে দুঃখিত হয় নাই কিন্তু রাত্রের কাজ হইতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার তাহাকে সরাইয়া দিয়াছেন, এই কথা ভাবিয়া সে দুঃখিত হইল। ম্যানেজিং ডিরেক্টার তাহাকে ডাকিলনা, তাহার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিলনা, অথচ তাহাকে শাস্তি দিল। এডিটার তাহার পক্ষ হইয়া কথা বলেনা, কারণ সে তাহার দল রাখিতেই ব্যস্ত। এডিটার জানে যে দল রাখিতে পারিলে এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে খুসী করিতে পারিলে তাহার প্রভাব ও চাকুরী কোন বাধা পাইবেনা। তাই এডিটারের দলের ভিতর যাহারা না পড়িল অথবা তাহাদের আশ্রয় ও সাহায্য যাহারা প্রার্থনা না করিল, তাহাদের আপিসে টিকিয়া থাকা মুস্কিল এবং শাসনদণ্ড তাহাদের উপরই পড়িবে। অশোক এই সব হীন দলাদলিকে ঘৃণা করে, তবুও আজ তাহার মনে হইল যে আপিসে যদি চাকুরী করিতেই হয়, তাহা হইলে মালিকদের

বা মালিকাশ্রিত ও অনুগৃহীত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সৌহৃদ্য রাখিয়া তাহাদের সুরে, লয়ে, তালে নিজেকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া লইলে গরমিলের আশঙ্কা কম থাকে এবং পদে পদে অপমানিত হইবার সুযোগও সংকীর্ণতর হইয়া আসে। অশোকের হঠাৎ মনে হইল যে, সে দিনের কাজ পাইল যখন শোভনা পিত্রালয়ে। অথচ এই দিনের কাজ গ্রহণ করিবার জন্য শোভনা তাহাকে কত অনুরোধই না করিয়াছে। স্বেচ্ছায় যাহা সে গ্রহণ করিতে পারিত এবং যাহা গ্রহণ করিলে শোভনা তৃপ্তি পাইত, আজ মনিবের হুকুমে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইল এবং শোভনার তৃপ্তি তাহাতে বাড়িলনা। অশোকের মনটা একটু দমিয়া গেল। যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে অশোক ঘটনাকে যতই হাল্‌কা করিয়া ভাবিতে লাগিল, মনে হইল তাহার মনের উপরে যেন একটা পাথর চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে কোন শান্তি পাইতেছেনা। অথচ এই সব ক্ষুদ্র কারণে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখা অশোকের স্বভাব নয়।

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রাম আসিলে অশোক নাবিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল যোগানন্দের আড্ডাতে কিছুক্ষণ সময় কাটাইলে তাহার মনের ভার কমিয়া যাইবে। সেই আড্ডার আকর্ষণ যোগানন্দের স্ত্রী, বিনীতা দেবী। যোগানন্দ আসানসোলে রেলওয়ের আপিসে কাজ করিত। সে না-কি একটা বিশেষ রকম ঘুস খাওয়াতে তাহার চাকুরিটী হারাইল কিন্তু আসানসোল হইতে আসিবার সময় তাহার আপিসের বড়বাবু মিঃ মুখার্জ্জির

বিধবা ভগ্নী বিনীতা দেবীকে সঙ্গে লইয়া আসিল। বিনীতা দেবী বয়সে ত্রিশের কোঠা পার হইয়াছেন—তাহার দেহের আঁটসাট’ বাঁধন ভাঙিয়া চুরিয়া বিনম্র হইয়াছে। তাহাতে যৌবনের উদ্দীপনা নাই বটে কিন্তু প্রলোভনের শক্তি যেন আরও বাড়িয়াছে। আসনসোলে থাকিতে যোগানন্দের সঙ্গে বিনীতা দেবীর প্রণয় ছিল গভীর। পাড়ার লোকেরা তাহা লইয়া কানাকানি করিত; কিন্তু তাহারা সেইসব অস্পষ্ট ইঙ্গিতকে গ্রাহ্য করিত না। মিঃ মুখার্জ্জির কানে যে সে-সব কথা একেবারে না পৌছিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তিনি এমন ভাব দেখাইতেন যে তিনি যেন কিছুই জানেন না বা শোনেন নাই।

বিনীতা দেবী সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘ। এই দৈর্ঘ্য তাঁহাকে আভিজাত্যের রূপ দিয়াছিল বিশেষভাবে। বিনীতা দেবী কাঁচা যৌবনের বয়স পার হইয়া গিয়াছেন, এবং তাহাতেই যেন তাঁহার রসভাণ্ড সুগভীর হইয়া উঠিয়াছে। এযেন মন্থনের পরে নিবিড় রসভাণ্ডের মোহিনী শক্তি—ইহাতে ফাঁকি কিছু নাই এবং যাহা আছে, তাহা যেন নিঃশেষ হইবার নয়। বিনীতা দেবীর নিস্তরঙ্গ যৌবনসমুদ্রের গভীরতা বেশী এবং যাহারা প্রকৃত ডুবুরী তাহারা মণিমাণিক্যের খোঁজ পান। আর যাহারা তরঙ্গের ফেনিলোচ্ছ্বাস ও উত্তালতা দেখিয়া আকৃষ্ট হন, তাহারা তরঙ্গের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সমুদ্রের তলদেশের মণিমাণিক্যের সন্ধান কখনও পান না। প্রকৃত জহুরী যাহারা, তাহারা মণির সন্ধানে নিজেকে নিঃশেষ

করে, তাই তাহারা ধনী। বিনীতা দেবীর সংস্পর্শে আসিলে মানুষ ধনী হয়, নিজেকে উজার করিয়া দিয়া নিঃস্বভাবে কালের তরঙ্গ গুণিতে হয়না। বিনীতা দেবীর উদ্দামহীন যৌবনের তটে মানুষ মন্দির গড়ে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে, এবং নিজের প্রেমের দীপ জ্বালিয়া রাখা যায়। দমকা হাওয়ায় আলো নিবিয়া যায় না, তরঙ্গাঘাতে তট ভাঙিয়া যায়না, চঞ্চলতায় ও চপলতায় দৃষ্টির দিগ্‌ভ্রম ঘটে না।

তাই যোগানন্দের চাকুরী ছাড়িতে হইল কিন্তু বিনীতা দেবীকে ছাড়িতে পারিল না। বিনীতা দেবী যোগানন্দের সঙ্গে পালাইয়া আসিতে কোন দ্বিধা অনুভব করিলেন না। যে-মানদণ্ডে সমাজ মানুষকে বিচার করে, সেই মানদণ্ডকে বিনীতা দেবী বিশ্বাস করেন না। নারীর পরিচয় তাহার নিষ্ঠাতে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে ভোলে না এবং যে যাহাকে ভোলে না, সে তাহাকে ভুলাইতে চাহে না। যে-নারী নিজের মন লইয়া খেলা করিতে চায়, অথচ প্রয়োজন হইলে সমাজের নিষেধাজ্ঞাকে শ্রদ্ধা করে, সে সমাজের মতে যত সতী নারীই হউক না কেন, বিনীতা দেবী তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। তাঁহার মতে, সমাজের অনুশাসন যে মানে, সে-নারী খেলিতে চায়, ভালবাসিতে চায় না। সমাজের হুইসল বাজিলে খেলার পালা সাঙ্গ করিয়া নিজেকে আবার আবৃত করিয়া ফেলে—তাহারই মহিমা ব্যাখ্যাত হয় কথায়, কাহিনীতে, গল্পে। কিন্তু যে-নারী ভালবাসিল, সে যদি সমাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আগাইয়া যায়, ছি-ছি রবে

সমাজনেতারা রক্তচক্ষু করিয়া উঠেন, দেশবাসী কলঙ্কের পসরা তাহাদের মাথায় তুলিয়া দেন। কিন্তু যে-নারী ভালবাসিয়া ভালবাসাকে ভুলিয়া গেল, সেই যে সবচেয়ে কলঙ্কিনী, একথা কেহই স্বীকার করিতে চায় না।

কলিকাতায় আসিয়া যোগানন্দ বিনীতা দেবীকে বৈদিক মতে বিবাহ করিয়াছে এবং স্বাভাবিক মতে বসবাস করিতেছে। যোগানন্দের আড্ডায় বহু বন্ধুবান্ধবের সমাগম হয়—কবি, শিল্পী, দালাল, রাজনীতিজ্ঞ, প্রফেসার ইত্যাদি। বিনীতা দেবীর আকর্ষণই মুখ্য। হাসির ঝলক, সতৃষ্ণ দৃষ্টি, মোহিনী ঢঙ, মনোহর কথোপকথন—সবই বিনীতা দেবীর আছে এবং কোথাও সে অনুদার নয়। যোগানন্দ শেয়ার মার্কেটে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে, কারণ, সে দেখিয়াছে যে অর্থ থাকিলে সমাজের আদেশ ও আজ্ঞা কড়া পর্দায় ধ্বনিত হয় না এবং সবাই তাহার প্রশংসায় মুখর হইবে এবং স্ত্রীও সর্ব্বসময় তাহাকে প্রেমের আবীরে লাল করিয়া দিবে।

অশোক যখন যোগানন্দের বাসায় গিয়া পৌঁছিল, তখন সেখানে কেহই আসে নাই। অশোক "বৌদি" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে উপরে উঠিয়া গেল। বিনীতা দেবীকে যোগানন্দের বন্ধুরা "বৌদি" বলিয়াই ডাকিত। বৌদি কিন্তু প্রত্যেকের নামের শেষে "বাবু" ব্যবহার করিয়া দূরত্ব প্রমাণ করিত।

ঘরে ঢুকিয়াই অশোক দেখিল যে তাহার বৌদি একখানি কার্পেটের আসনে বসিয়া দেহকে আগাগোড়া মেরুণ রঙের সিল্কের

চাদর দিয়া আবৃত করিয়া অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় কপালে চন্দনের ফোঁটা মাখিয়া বাংলা সংস্করণের "গীতা" পড়িতেছেন। অশোক বিনীতা দেবীকে এতো সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবে দেখে নাই। তাই দেখিয়া প্রথমটা চমকাইল, তারপর বিস্মিত হইল এবং তারপর বিমুগ্ধ হইল। বাহিরের সাজসজ্জা যে কত অনাবশ্যক, বিনীতা দেবীকে দেখিয়া তাহার মনে হইল এবং তাহার চতুর্দ্দিকে যে গার্হস্থ্যের সাদাসিধে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহাকে সত্যিই আকৃষ্ট করিল।

অশোক ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিল, অসময়ে এসেছি বৌদি, মাপ করো।

বিনীতা দেবী এক চৌকি দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। গায়ের চাদরটা আর একটু ভাল করিয়া দিয়া বিনীতা দেবী একটু হাসিলেন। সেই হাসি যেন যুগপৎ অশোককে সম্ভাষণ জানাইল এবং তাহার অসময়ে আসিবার জন্য মাপ করিয়াছে, তাহাও জানাইল।

অশোক চৌকিতে বসিয়া বিনীতা দেবীর অনাবৃত দেহের চাদরাবৃত অবস্থা লক্ষ্য করিল। তাই কি কথা বলিবে ভাবিয়া পাইল না এবং বসিয়া থাকিবে কি-না তাহাও বুঝিতে পারিল না। অশোক লোভী নয়, কিন্তু আজ ক্ষণকালের জন্য মনে হইল যে তাহার নির্লোভ রুচি সব সময়ে শ্রেষ্ঠ নয়।

বিনীতা দেবী নিজের দেহের দিকে একবার তাকাইলেন, আংটিটাও একবার দেখিলেন, হাতের চুড়ির গুচ্ছকে টানিয়া

উপরে উঠাইয়া দিলেন এবং তারপর যে বইখানা পড়িতেছিলেন, তাহার পাতা উল্টাইলেন।

অশোক কহিল, বৌদি, এতো সংযত চিত্তে কি বই পড়ছেন?

বিনীতা দেবী হাসিয়া কহিলেন, পড়ছি গীতার বাংলা সংস্করণ কিন্তু চিত্ত সংযমের চেষ্টায় নয়। নিরাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করার প্রতি আসক্তি বাড়াবার জন্য গীতার মর্ম্মকথা গ্রহণ করার চেষ্টা করছি। আপনি গীতা নিশ্চয়ই পড়েছেন।

অশোক তাচ্ছিল্যের সুরে কহিল, গীতা বোঝবার মত সংস্কৃত বিদ্যায় দখল আমার নেই এবং বাংলা সংস্করণ পড়বার অনুপ্রেরণা কখনও বোধ করি নি।

বিনীতা দেবী ভ্রূ কুঁচকাইয়া চোখ দুটিকে ঈষৎ ছোট করিয়া কহিলেন, আমার ত মনে হয় কর্ম্মবীর মানুষের পক্ষে গীতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ।

অশোক বিস্মিত হইল। যে-নারীকে দেখিয়া পুরুষ ভোলে, সে-নারীর মুখে গীতার ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

অশোক হাসিয়া কহিল, গীতা কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্মগ্রন্থ, একথা আমি কখনও বিশ্বাস করিনি। আভিজাত্যপূর্ণ ও সংস্কৃত মনের চিন্তার বিলাস হিসাবেই আমি গীতাকে গ্রহণ করি। নিষ্কাম-কর্ম্ম হ'ল বুর্জোয়া মনোভাবের একটা বিলাসের দিক। আমরা কর্ম্ম-সেতুর আশ্রয় গ্রহণ করি নিজের অভিলাষ পূরণের জন্য, আমরা ধর্ম্মসেতুর পিচ্ছিল পথকে বিশ্বাস করিনে। পৃথিবীকে

পাপমুক্ত করা আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। আমরা দুঃখ ও দুর্গতির কারাগার ভাঙতে চাই, ঐশ্বর্য্যের স্বাদ গ্রহণ করতে চাই—ঐশ্বর্য্যকে বর্জ্জন করতে নয়।

বিনীতা দেবী যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, আপনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিশ্বাস করেন, অথচ ধর্ম্মের জয় হবে, একথা মানেন না? অন্যায় যে করে, তার পরাজয় ঘোষিত হোক, এই ইচ্ছাও কি আপনার নেই?

অশোক ধীরভাবে কহিল, বৌদি, ন্যায়-অন্যায় মানি, শুধু মানি না ন্যায়-অন্যায়ের প্রচলিত সংজ্ঞাকে। মানুষের দুর্গতিকে আমরা অন্যায় ভাবি। পৃথিবীর সবচেয়ে অসত্য ধর্ম্ম হ'ল মানুষের শোষণ নীতি। কুরুক্ষেত্রে যে-সত্যের ধ্বজা স্থাপিত হয়েছে, সে-সত্য হ'লো শাস্ত্রানুশাসিত পাপ-পুণ্যের সঙ্গে জড়িত। আমরা শাস্ত্রের চেয়ে মানুষকে প্রাধান্য দিই বেশী। আমরা মানুষের বেদনাকে স্বীকার করি, গ্রহণ করি এবং দূরীকরণের চেষ্টা করি।

বিনীতা দেবী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না? শাস্ত্রসম্মত চলার ত্রুটিকে অপ্রশংসা করেন না?

অশোক গর্ব্বের সঙ্গে কহিল, আমরা যে-শাস্ত্রে বিশ্বাস করি, তা ব্রাহ্মণ-শাসিত নয়।

বিনীতা দেবী খুসী হইলেন। ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, আপনি ব্রাহ্মণের অনুশাসন মানেন না, কিন্তু বৌদির অনু-

শাসন মানতে বোধহয় আপনার আপত্তি নেই। চলুন না পাশের ঘরে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার বেশ লাগে।

শেষ লাইনটা বিনীতা দেবী এতো আলগোছে বলিলেন যে, অশোকের সর্ব্বশরীর যেন রিমঝিম করিয়া উঠিল। মনে হইল কোথায় সে যেন তলাইয়া যাইতেছে—নীচে নামিবার সিঁড়ি আছে কিন্তু উঠিবার উপায় নাই, কোন কিছু ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিবারও উপায় নাই ; এই পথ নামিবারই পথ।

বিনীতা দেবী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অশোক বিনীতা দেবীকে আগাগোড়া নিরীক্ষণ করিল। বিনীতা দেবী বুঝিলেন, একবার অশোকের দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

অশোক বলিল, যোগানন্দ কখন আসবে?

বিনীতা দেবী হাসিয়া কহিলেন, তিনি এলে কি আপনার থাকতে নেই।

অশোক যেন লজ্জা পাইল। সে কহিল, তা' নয়,......

বিনীতা দেবী অশোকের কথা শেষ করিতে দিলেন না, তাড়া দিয়া বলিলেন, আসুন না। আপনাকে যখন আজ পেয়েছি, তখন সহজে ছাড়ছি না। আপনি আমাকে এড়িয়ে চলেন কেন বলতে পারেন! আমি কি সাপ না বাঘ যে, আমাকে এতো ভয়।

তারপর সস্মিতভাবে ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, আমাদের ছায়া মাড়ালে তো আর আপনার পতিত হবার ভয় নেই!

অশোক চৌকি ছাড়িয়া উঠিল। সে সহজভাবে কহিল,

বৌদি, তোমার ছায়ায় যে পতিত হবে তার উদ্ধার পাবার কোন লোভই থাকবেনা। তুমি মানুষের সব লোভ শেষ করতে পার, তাই তোমার কাছে এসে আর কোন লোভই থাকেনা।

বিনীতা দেবী ঘাড় বাঁকাইয়া কহিলেন, কিন্তু লোভে পাপ হয়, তা' জানেন ?

তার কানের দুল দুলিয়া উঠিল, ঘাড় হইতে চাদরের অংশ সরিয়া গেল, অনাবৃত সুগোল দক্ষিণবাহু সমস্ত দ্বিধাকে ডুবাইয়া দিল। অশোকের রাত্রিতে কাজ, তাহা সে একবার স্মরণ করিয়া ভুলিয়া গেল। বিনীতা দেবীকে অনুসরণ করিয়া পাশের ঘরে যাইতে যাইতে অশোক বলিল, তাই আমরা পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস্ করিনে, তোমার মত বৌদি যে কোন পুরুষকে অবিশ্বাসী করে দিতে পারে।

—ইস্, তাই না-কি, বলিয়া বিনীতা দেবী পাশের ঘরে ঢুকিয়া অশোককে একটি বসিবার মোড়া দিল, এবং সে নিজে একটা পিড়িতে বসিয়া ষ্টোভ জ্বালাইতে আরম্ভ করিল।

অশোক মোড়াতে বসিয়া কহিল, এখন ষ্টোভ জ্বেলে কি করবে, বৌদি ?

বিনীতা দেবী কাজে ব্যস্ত থাকিয়াই কহিলেন, আজ পূর্ণিমা, ভাত খাবোনা, তাই লুচি করচি। লুচি তৈরী করতে করতে কথা বলা যাবে, নইলে আপনার বন্ধু এসেই খেতে চাইবেন এবং খাওয়া না পেলে যা' কাণ্ড করবেন, তা' আমার বা আপনার পক্ষে সুখের হবেনা।

অশোক হাসিয়া কহিল, আপনাদের পারিবারিক কলহ আমাকে কি ভাবে স্পর্শ করে?

বিনীতা দেবী একটু আদরমিশ্রিত অভিমানের সুরে কহিলেন, আমার অ-সুখে কি আপনার অ-সুখ হবে না?

অশোক স্বীকার করিয়া কহিল, আপনার অ-সুখ সৃষ্টি করার মত যোগানন্দের ক্ষমতা আছে, তা' আমি জানতেম না।

বিনীতা দেবী সহজসুরে কহিলেন, স্বামীদের ক্ষমতা যে কত, তা' কি আপনি নিজে স্বামী হয়ে জানেন না? আমাদের স্বামীদের রাগ করবার অধিকার সব সময়ই থাকে—আমাদের মনে ব্যথা দেবার অধিকার সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করেন, শুধু প্রয়োজন বোধ করেন না আমাদের হৃদয়কে অধিকার করতে।

অশোকের মনটা ছ্যাঁক করিয়া উঠিল, শোভনার কথা মনে পড়িল। আবার ভুলিল। বিনীতা দেবীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া কাহারও নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে ভাবিতে ইচ্ছা করেনা, সংসারে মাঝে মাঝে এমন নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাহাদের সংস্পর্শে আসিলে পুরুষ নিজেকে ভোলে, লোভে পড়ে এবং প্রলুব্ধ হইয়া নিজের সংযম হারাইয়া ফেলে। বিনীতা দেবী সেই জাতের স্ত্রীলোক যাহার আওয়তায় আসিলে পুরুষ নিজের অসংযমের জন্য দুঃখ করিবার কারণ খুঁজিয়া পায়না এবং জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে সংযমের প্রয়োজনীয়তা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। জীবনকে ভোগ

করিবার পক্ষে সমাজের অনুশাসন ও সংযম যে কত বড় অন্তরায় পুরুষ প্রতিপলকে তাহা বুঝিতে পারে।

অশোককে নীরব থাকিতে দেখিয়া বিনীতা দেবী চোখ চাহিয়া তাকাইলেন। অশোকের দৃষ্টি পড়িল বিনীতা দেবীর কানের নীচে একটি তিলের প্রতি। সেই তিলটি সে এতদিন লক্ষ্য করে নাই, আজ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল—কারণ তাহার ভাল লাগিল। অশোকের চোখ দুইটি যেন জ্বলিয়া উঠিল।

বিনীতা দেবী হাসিয়া কহিলেন, আপনার স্ত্রীর শরীর কেমন আছে?

অশোকের স্বপ্নঘোর ভাঙিল। স্ত্রীর কথা শুনিয়া স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল।

শুধু কহিল, তিনি পিত্রালয়ে—ভালই আছেন।

বিনীতা দেবী বুঝিলেন যে অশোক তাহার স্ত্রীর আলোচনা পছন্দ করিতেছে না। তাই হাসিয়া কহিলেন, আপনি তা'হলে আজ স্বাধীন। আমাদের এখানেই আজ খেয়ে যাননা?

অশোক অসম্মতি জানাইল।

বিনীতা দেবী অবনত মস্তকেই কহিলেন, আমার হাতের লুচিতে আপনার পছন্দ হবেনা, আমি জানতেম। এই বলিয়া অলসদৃষ্টিতে অশোকের দিকে বিনীতা দেবী তাকাইলেন।

অশোক কহিল, আপনার হাতের লুচির প্রতি লোভ আমার প্রচুর কিন্তু লোভ সম্বরণ করাই কি পুরুষের ধর্ম্ম নয়?

বিনীতা দেবী কহিলেন, যদি লোভই থাকে, তাহ'লে তাকে জয় করবার চেষ্টা করে লাভ কি! আপনিই না বললেন যে আমি লোভের ভাণ্ড—এই ভাণ্ডের খোঁজ পেলে আর সব ভোলা যায়। সত্যিই কি, অশোকবাবু, আমার মধ্যে লোভের বস্তু আছে? আমার অজেয় কিছু নেই!

অশোক কহিল, বৌদি, তোমার কাছে এলে ভালবাসার প্রশ্ন তলিয়ে যায়, ভাল লাগাটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনে ভালবাসাটা যে কত তুচ্ছ, ভাল লাগাটাই যে সবচেয়ে কাম্য, এই শিক্ষা তোমার কাছে এলে পাওয়া যায়। ভালবাসায় বন্ধন আছে, ভাল লাগার গতি বন্ধনহীন।

বিনীতা দেবী হাসিয়া কহিলেন, আমি মানি অশোকবাবু যে, যার ভাল লাগল না তার যদি ভালবাসতে হয়, তা' হ'ল অত্যাচার। কিন্তু সমাজ যে তা' মানে না। ভাল লাগা ক্ষণস্থায়ী হ'তে পারে কিন্তু সেই ক্ষণের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। সেই মুহূর্ত্তটুকু মানুষের জীবনে অমূল্য। ভালবাসা চিরস্থায়ী হ'তে পারে কিন্তু গতিশীল মনকে চিরস্থায়ীর শিকলে বেঁধে রাখলে বিকলতা আসে, জটিলতা বাড়ে এবং স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। যে নারী বিত্তহীন, স্থায়ী অবলম্বন সেই খোঁজে, কিন্তু যার নিজের ঐশ্বর্য্য আছে, সে তো সংসারে অবলম্বনহীন নয়।

অশোক কহিল, আমাদের দেশে মেয়েদের বিত্ত নেই, তাই তাদের অবলম্বন খোঁজবার ভার নিয়েছে সমাজ; তাদের চিত্ত নেই, তাই তাদের শুভ-মিলনক্ষণ লেখা আছে অদৃষ্টের লেখনে। সমাজ

ও নিয়তির অক্টোপাসে আমাদের মেয়েরা আবদ্ধ—তাই তাঁরা গৃহের প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করেন, স্বামীর চিত্তে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই তো বৌদি তোমাকে ভাল লাগে—তুমি যে বিত্তহীন নও। তুমি জয় করবে পুরুষের চিত্ত, আশ্রয় গড়বে পুরুষের হৃদয়মন্দিরে। তোমাকে আশ্রয়হীন করে এমন পুরুষ নেই।

বিনীতা দেবী একটী প্লেট ভরিয়া লুচি দিয়া কহিলেন, আপনারা বড্ড মিথ্যুক! কথা সাজিয়ে বলতে পারেন, কিন্তু কথার রসে আমাদের তৃপ্তি আসে না। তাতে শুধু অতৃপ্তি বাড়ে। সংসারে আপনাদের কথার পাঁকেই ঘুরি—স্বচ্ছতা অস্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে, কিন্তু বাসনার তীর পেরিয়ে তৃপ্তির মহাসাগরে কখনও পৌঁছাতে পারিনে। কথার সাঁজি থেকে যে-মালা আপনারা আমাদের জন্য রচনা করেন, তা' যদি সত্যি হ'ত, আমাদের শোভা আরও বাড়ত।

কথাগুলি যেন অশোকের পৌরুষকে আঘাত করিল। সে মিথ্যা বাণী রচনা করিয়া বিনীতা দেবীকে সুখী করিতে চাহিয়াছিল, একথা সে স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিল। অথচ [illegible] আবেগে সে যে-সব কথা বলিয়াছে, তাহা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চায়, ইহাও সে কখন ভাবে নাই। অশোক আবেগের তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া যে-মোহনায় আসিয়া পৌঁছিল, সেখানে স্থির হইয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব—ডাঙ্গায় বিশ্রাম লইবার সুযোগও যেন সে হারাইয়াছে। অশোক যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু যে-শিকারী তাহার শিকারকে বাণবিদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে

গোঙরাইতে দেখিলে শিকারীর অন্তর গর্ব্বে ভরিয়া ওঠে এবং বাণবিদ্ধ শিকারকে সে আরও আঘাত করিতে থাকে। শিকারীর পক্ষে সন্ধানের অব্যর্থতা হইল তাহার চরম কলঙ্ক।

অশোককে চুপ থাকিতে দেখিয়া বিনীতা দেবী কহিলেন, তাতে লজ্জা কি অশোকবাবু, আমরা ফাঁকা স্তোক বাক্য শুনতে অভ্যস্ত! আপনি অন্য পুরুষজাত থেকে আলাদা হবেন, এ তো আর সম্ভব নয়!

তারপর খুব স্নেহের স্বরে বলিলেন, আপনাকে আর ক'খানা লুচি দেব? আমাকে ভাল না লাগলেও আমার হাতের লুচি-তরকারী বোধ হয় খারাপ নয়। কারণ, রান্নার ব্যাপারে আমার প্রসিদ্ধি আছে, একথা সবাই মানে।

অশোক কহিল, বৌদি, পুরুষ জাতের প্রতি তুমি এতোটা শ্রদ্ধাহীন, তা' আমি জানতেম না। আমাদের স্তোক-বাক্য ফাঁকা, এতথ্য তুমি কি ভাবে সংগ্রহ করেছ, জানিনা। আমরা আজ যা' বলি, কাল হয়তো তা' মানিনে। কিন্তু আজকের বলা তার জন্ত মিথ্যে নয়। তোমাকে ভাল লাগে, এই কথাটাই আজ আমার কাছে সবচেয়ে বড় সত্য কথা। মানুষের ভাল লাগা বা ভালবাসা শাশ্বত না হ'লে যে তা' মিথ্যা হ'লো, তা' আমি বিশ্বাস করি না। যে-মুহূর্ত্তগুলি তোমাদের জন্য উৎসর্গ করি, তা' ফাঁকিও নয়, ফাঁকাও নয়। সেই শুভ মুহূর্ত্তের গণ্ডুষে নিজের সারাজীবন ভরে রাখতে পারি না বলে আমাদের মিথ্যাচারী বলতে পারো না। আমাদের হৃদয়-বীণায় যে-ধ্বনি আজ ওঠে, তা' হয়তো পরে

মিলিয়ে যায়, কিন্তু আজকের সেই সুর ও সঙ্গীত অসত্য নয়। আমাদের প্রেম অচপল নয় বলে তা' মিথ্যে নয়।

বিনীতা দেবী কহিলেন, আমি জানি অশোকবাবু যে, নিবিড় মুহূর্ত্ত ফাঁকা ও অগভীর শাশ্বতকালের চেয়ে মূল্যবান। এবং সে কথা জানি বলেই আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ।

কথাটা বলিয়া বিনীতা দেবী ফিক্ করিয়া হাসিলেন।

অশোক খাওয়া শেষ করিয়া হাত ধুইয়া রুমালে মুখ মুছিয়া বলিল, বৌদি, আজকের কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

বিনীতা দেবী কহিলেন, চলুন বসবার ঘরে।

অশোক নিজের হাতের ঘড়ি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। কহিল, রাত দশটা বেজেছে। আমার ত অফিসে যেতে হবে। যোগানন্দ এখনও আসেনি ?

বিনীতা দেবী অশোকের হাতটা ধরিয়া একটু টানিয়া লইয়া বলিল, চলুন না—অন্ততঃ যতক্ষণ আপনার বন্ধু না আসেন।

অশোক স্পর্শ পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। সে বুঝিল যে আপত্তি জানাইয়া লাভ নাই।

বিনীতা দেবী একটা কৌচে বসিয়া অশোককে টানিয়া পাশে বসাইল। বিনীতা দেবীর চুলের গন্ধ অশোকের নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

বিনীতা দেবী অশোকের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, আমাকে কেন ভাল লাগে বলুন তো ? আমার কি-ই বা আছে, আমার ত দুঃখ হয় যে, আমার কিছুই নেই !

এই কথাগুলি বলিয়া বিনীতা দেবী অশোকের হাতটা চাপিয়া ধরিলেন। মনে হইল যে-কথা বিনীতা দেবী বলিতে পারিলেন না, সেই কথা তিনি আদরপূর্ণ স্পর্শে বুঝাইতে চাহেন। কথার সাহায্যে যে, সব কথা বলা যায় না অশোক তাহা জানিত।

বিনীতা দেবী তাহার সুকোমল ও সুপুষ্ট দেহের ভার অশোকের উপর ন্যস্ত করিয়া কহিলেন, যদি আমাদের এভাবে কেউ দেখে, লোকে কি বলবে? কিন্তু লোকের অপবাদকে আপনি ভয় করেন? আচ্ছা, এতে অপবাদেরই বা কি আছে! কি বলেন, অশোকবাবু?

অশোক তখন অপবাদের কথা ভাবিতেছিল না। ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে—শ্বাসের গতি দেখিয়া মনে হইল যে তাহা যে কোন সময়ে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। অশোকের শিক্ষা, অশোকের সংযত রুচি, অশোকের সংস্কৃতি সমস্ত যুগপৎ জাগিয়া উঠিল। অশোকের সামাজিক মনের তার এতো কড়া পর্দ্দায় বাঁধা থাকে যে, তাহা ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। অশোক ভয়ে চোখ বুজিল।

বিনীতা দেবীর এলায়িত দেহের লীলায়িত ভঙ্গীর এতো সম্মোহন শক্তি আছে অশোক তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। যখন বুঝিল, তখন সে নিরুপায় শিশুর মত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অশোকের মৌনভাব বিনীতা দেবীর ভাল লাগিল না।

বিনীতা দেবী কহিলেন, আপনাকে দেখে মনে হয় যে, আপনি সত্যিকালের ঋষি, আমি যেন আপনার তপোভঙ্গের আয়োজন করছি। ঋষির জীবনে তপস্যার মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু

আমাদের সাংসারিক জীবনে তপস্যা হ'ল নিজেকে শাস্তি দেওয়া। কি বলেন, অশোক বাবু, তপস্যাই মূল্যবান, আর আমরাই মূল্যহীন ?

এই বলিয়া বিনীতা দেবী অশোকের একটি হাত তাহার নরম বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া খান্ খান্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। অশোকের হাতে তখন চেতনা নাই —তা একেবারে অরশ।

অশোক কহিল, আজকের দিনের জন্য তোমাকে হয়ত অনেক মনস্তাপ সইতে হবে। তুমি আমার বন্ধুপত্নী, এই সীমানা অতিক্রম করবার ইচ্ছে থাকলেও আমার শক্তি নেই।

বিনীতা দেবী হাসিয়া কহিলেন, আপনি ভীরু, তাই সীমানার কথা ভাবছেন। পুকুর অগভীর, তাই সে সীমাবদ্ধ থাকে; সমুদ্র গভীর, তাই তার জোয়ারের সময় অনেক সীমানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু সীমানা আবার ভাটার সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, লোকে সেই সীমানাকেই স্বীকার করে। যাদের জীবনে গভীরতা কম, সীমাবদ্ধ তারাই থাকে বা থাকতে পারে। জীবনের যে-মুহূর্ত্তে মানুষ সব ভুলতে চায়, তখনও সীমানা মেনে চলতে হবে ?

অশোক কহিল, বৌদি, আমি নিজে কিছুই মানিনে। সমাজের সীমানা যারা টেনে দিয়েছে, তাদের পীড়নে আমরা ব্যথিত। প্রলয় নৃত্যের ছন্দে আমাদের হৃদয়ও মথিত—চতুর্দ্দিকের বেষ্টনের বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান। কিন্তু বেদনা যার চিত্তে সদা

জাগ্রত, খেলার আসরে সে অপটু হবেই। আমাকে ক্ষমা করো, বৌদি।

অশোকের যে-হাতটি বিনীতা দেবী দুই মুঠা দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, অশোক বাবু, মিথ্যাই আপনার অহঙ্কার। আপনারা প্রতারক—প্রতারণা আপনাদের ধর্ম্ম। দুর্গতদের সেবার শক্তি প্রতারকদের নেই। শক্তির যাদের অভাব, প্রতারণার আশ্রয় তারাই নেয়।

কথা বলিয়াই বিনীতা দেবী চোখ বুজিলেন। বাম হাতের চুড়ির শব্দ ঝন ঝন করিয়া উঠিল—ডান হাত দিয়া নিজের কপালটা চাপিয়া ধরিলেন। অশোক বিনীতা দেবীর দিকে একবার তাকাইল। অসম্বৃত বস্ত্রখণ্ড বিনীতা দেবীর দেহের রহস্যকে আরও কুহকময়ী করিয়া তুলিল। অশোকের শরীর যেন এক অপূর্ব্ব নেশায় ভরপুর হইয়া গেল। সে যেন মাতাল হইয়া উঠিল—তাহার দৃষ্টি যেন ঝাপ্‌সা হইয়া গেল, মনে হইল বিনীতা দেবীকে জড়াইয়া ধরিয়া রূঢ় কথা শুনাইবার জন্য এখনি সে ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সে অপটু নয়, একথা সে জানাইতে চাহে; সমাজের সীমানাবোধ তাহার নাই, একথা সে বুঝাইতে চাহে; সমাজের নিষেধাজ্ঞা সে লঙ্ঘন করিতে সক্ষম, একথা সে গর্ব্বের সঙ্গে প্রচার করিতে চাহে। মোট কথা, সে শক্তিহীন নহে! এই শক্তির প্রাচুর্য্য যাহার আছে, ধ্বংসলীলার কঠিন আঘাত সে-ই সহিতে পারে, প্রলয়ের আনন্দ সে-ই ভোগ করিতে পারে।

অশোক শুধু ডাকিল, বৌদি?

বিনীতা দেবী তাহার দক্ষিণ হস্ত অশোকের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। অশোক যেন উত্তাল সমুদ্রে আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল। ডান হাতটিকে দুই মুঠা দিয়া ধরিয়া, পিষিয়া কহিল, বৌদি, রাগ করেছ! আমাকে তুমি উদ্ধার কর। আমি দুর্বল —আমার অহঙ্কার যে এতো মিথ্যে, তা' আমি জানতেম না।

বিনীতা দেবী হাসিলেন, অশোকের দিকে তাকাইয়া আলুগোছে কহিলেন, সত্যি।

এই একটি কথার ভিতর বিনীতা দেবী যেন নিজেকে ঢালিয়া দিলেন, অশোকও যেন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া শান্ত হইতে পারিল।

ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বিনীতা দেবী বুঝিলেন যে তাঁহার স্বামী আসিতেছেন। তিনি কৌচ ছাড়িয়া গায়ে চাদরটা ভালভাবে জড়াইয়া অদূরে আর একটি কৌচে গিয়া বসিলেন।

অশোক কোন শব্দ পায় নাই, তাই সে আশ্চর্য্য হইয়া কি কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় যোগানন্দ ঘরে প্রবেশ করিল।

যোগানন্দ ঘরে প্রবেশ করিয়া অশোককে দেখিয়া খুসী হইল। সে কহিল, ভালই হ'ল, অশোক! তোমার কাছে আজ রাত্রে যাব ঠিক করেছিলাম। আমার বন্ধু মিঃ নাগ প্রভাত কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। তাদের এই বৎসরের রিপোর্ট বেরিয়েছে—তারা পাঁচ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিয়েছে। তাদের সম্বন্ধে ভাই একটা ছোট প্রশংসাসূচক লেখা প্রকাশ করে দিয়ো।

এই বলিয়া সে পকেট হইতে টাইপ-করা একপাতা লেখা বাহির করিল।

অশোক বলিল, তোমার বন্ধুকে বিজ্ঞাপন দিতে বলো, তাহ'লে সবই ছাপা হবে।

যোগানন্দ বলিল, ওরা বিজ্ঞাপন দেয়, কিন্তু আমি মিঃ নাগকে তোমার ভরসায় কথা দিয়েছি। আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। আর ভাই, ওসব ক্যাপিটালিষ্ট হাতে থাকলে সুবিধে ছাড়া অসুবিধে নেই।

অশোক হাসিল। ক্যাপিটালিষ্টের নিকট হইতে উপকার চাহিলে পাওয়া যায়, এই বিশ্বাস তাহার নাই—যদিও সে জানে যে, উপকার করিতে হইলে একমাত্র ক্যাপিটালিষ্টই পারেন। অশোক কোন কথাই বলিল না—অন্ততঃ ক্যাপিটালিষ্টদের লইয়া যোগানন্দের সঙ্গে কলহ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। সে যোগানন্দের হাত হইতে লেখাটা গ্রহণ করিয়া বিনীতা দেবীর দিকে একবার তাকাইল।

বিনীতাদেবী হাসিয়া কহিলেন, আমি অশোক বাবুকে জোর করে রেখে ভালই করেছি। তা' না হ'লে ত আবার তাঁর কাছে যেতে হ'তো।

কথাটা তিনি স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন বটে, কিন্তু অশোকের দিকে একটু তাকাইয়া লইলেন।

যোগানন্দ স্ত্রীর বুদ্ধি দেখিয়া খুসী হইল এবং গর্কের সঙ্গে একবার অশোকের দিকে তাকাইল। বিনীতা দেবীকে স্ত্রীরূপে

পাইয়া যোগানন্দ নিজেকে ধন্য মনে করিত এবং বন্ধুমহলে সে ইহার জন্য যথেষ্ট খাতিরও পাইত।

অশোক গুড্ নাইট বলিয়া চলিয়া গেল। বিনীতা দেবী স্বামীর কোটের বাটন হোল হইতে ফুলটি খুলিয়া লইয়া গন্ধ শুঁকিল। হাসিয়া যোগানন্দের দিকে তাকাইল—অশোকের যাওটা তিনি লক্ষ্যও করিলেন না।

যোগানন্দ স্ত্রীকে সিঁড়ির আলোটা জ্বালাইয়া দিতে বলিল। তখন অশোকের জুতার শব্দ মিলাইয়া গিয়াছে।

বিনীতা দেবী ফুলটি হাতে করিয়া কৌচে শুইয়া পড়িল। মনে হইল সে যেন পরিশ্রান্ত, অবসন্ন। চোখ তাহার বুজিয়া আসিল। বিনীতা দেবীর ক্লান্ত মূর্ত্তি যোগানন্দের ক্লান্তি হরণ করিল—সে তাহার স্ত্রীর পাশে গিয়া বসিয়া ডাকিল, বিনু?

বিনীতা দেবী চোখ বুজিয়াই হাসিলেন: কৌচে পাশ ফিরিয়া তাকাইলেন, তাঁহার দেহের বস্ত্রাবরণ মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। অনাবৃত দেহের আকর্ষণী শক্তি যোগানন্দের সমস্ত রসকে যেন চুষিয়া শেষ করিয়া দিল। যোগানন্দের মনে কোনদিন কোন অভিযোগের সৌধ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বিনীতা দেবীর যৌবনের মধুচাকে যে মধু ও হুল আছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যোগানন্দ নিজের সত্তা কোনদিন অনুভব করিতে চেষ্টা করে নাই। যে-নারী স্বামীকে পায় মুঠার ভিতর, সে-নারীর ঐশ্বর্য্য মদের ফেনার মত বাহিরে উপ্‌চাইয়া পড়িতে চায়। স্বামীকে পাইতে হইলে যাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্যয়িত হয়, সে-নারীই একমাত্র অন্দরে থাকিয়া

মুক্তির আস্বাদ পায়। নচেৎ, অন্দরে ঐশ্বর্য্যশালী যৌবনময়ী নারীরা আহত হয়—ব্যথা পায় এবং অন্দরকে ব্যথিত করিয়া তোলে। যোগানন্দ বিনীতা দেবীর কাছে পুতুল মাত্র, তাই বাহিরের প্রাঙ্গণে সে খেলার সাথী চায়। পুতুলের সঙ্গে খেলা করিয়া যাহারা তৃপ্তি পান, তাঁহারা সুখী হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের যৌবন নাই। যৌবন চায় সাথী—এক তালে, এক সুরে, এক লয়ে পথে চলিতে।

যোগানন্দ অবলুণ্ঠিত বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বিনীতা দেবীর নগ্ন দেহকে আবৃত করিয়া দিল। বিনীতা দেবী একচোখ দিয়া স্বামীর দিকে তাকাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—স্বামীকে আদর করিয়া জড়াইয়া ধরিলেন।

যোগানন্দ খুসীতে ভরপুর হইয়া উঠিল, তাই কোন কথা সে বলিলনা।

বিনীতা দেবী ভাবিলেন—এই তো পুরুষ!

অশোকের কথা তখনও সে ভুলিতে পারে নাই, পারে নাই বলিয়াই স্বামীর সঙ্গে এই মৌন অভিনয়।

আট

অশোক এখন দিনের বেলায় কাজ করে। ঘরের যে-টেবিলে সে কাজ করে, সেই টেবিলে লাইব্রেরিয়ান বসে। এই লোকটার পদবী যদিও লাইব্রেরিয়ান, কিন্তু লাইব্রেরী বলিয়া ক্রনিকল আপিসে কিছুই নাই। যে বই সমালোচনার জন্য আসে, তাহা থাকে সমালোচকদের কাছে। রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক কাগজে কেউ বড় অনুভব করে না, কারণ তাহারা জানে যে, তথ্যের চেয়ে মূল্যবান হইল তাহাদের পার্টির রীতি ও নীতি এবং তাহাদের পার্টির তথ্যই যে একমাত্র সত্য, এ কথা ক্রনিকল আপিসে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। সেই লাইব্রেরিয়ানের কাজ হইল বিদেশী কাগজ হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া রবিবার বা অন্যদিনের কাগজের জন্য ছাপাইতে দেওয়া। সেই লাইব্রেরীয়ানটি মনে করে যে এইভাবে বাংলাদেশকে সে বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন রাখিতেছে। রাশিয়ার পক্ষে যেখানে যাহা কিছু প্রকাশ হইবে, সে তাহা ছাপাইতে দিবে। তাহার ধারণা যে, সোভিয়েট নীতি প্রচার করিলেই দেশকে শ্রেষ্ঠভাবে সেবা করা হইবে। এই লাইব্রেরীয়ানটির বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর

অশোকের শ্রদ্ধা নাই, তাই সে চুপ করিয়া একাকী কাজ করে। তাহার কাজ এখন সহজ, কোন গুরুত্ব নাই এবং দায়িত্বও নাই। আপিসের দায়িত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় কাজে তাহার স্থান নাই—তাই সে অবহেলিত। কিন্তু অশোক যত অবহেলিতই হউক না কেন, আপিসে তাহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তাহার শিক্ষা, রুচি, মতের দৃঢ়তা, চরিত্রের সংযম সবাইকে আকৃষ্ট করে। মালিকদের কোপানলে সে যতই দগ্ধ হউক না কেন, সে সহকর্ম্মীদের ভিতর খুব প্রিয়। তাহার মিষ্ট স্বভাব, সাহিত্যানুরাগ, মনের সংস্কৃতি ও চিত্তের শালীনতা তাহাকে এক বিশেষ রূপ দিয়াছে এবং তাহার জন্য সে উপেক্ষিত হইতে পারে না। অবহেলিত অশোকের সম্মান সহকর্ম্মীদের কাছে এতটুকুও কমে নাই—তাহার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, তাহার অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি যে সম্পাদকের কানে পৌঁছায় নাই, এমন নহে। কিন্তু যে-পথকে অবলম্বন করিয়া সম্পাদক আজ সম্পাদকের শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, সেই পথযাত্রীদের পক্ষে ন্যায়ের প্রতি মমতা এবং গুণের প্রতি দরদ দেখানো সম্ভব নয়।

অশোক নীরবে কাজ করিয়া যায়। যখনই প্রয়োজন হয় প্রিণ্টার তাহার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে—অশোক নিউজ এডিটারকে দেখাইয়া দেয়।

প্রিণ্টার আসিয়া অভিযোগ করে যে, নতুন নাইট এডিটার ঠিক সময়মত কপি দেন না—ফলে, কাগজ দেরী হইয়া যায়। কাগজের সংবাদ সাজানো ভাল হয় না এবং টেলিগ্রাম পেজে

হেডিং দিবার যে রীতি অশোক চালাইত, তাহা আর চলিতেছে না। কাগজে ডবল কলম হেড লাইন থাকে না—থাকিলেও তাহা প্রচলিত রীতি অনুসারে হয় না, "সামারি" লিখিয়া দিতে বলিলে নতুন নাইট এডিটার অসন্তুষ্ট হন। নাইট এডিটার রাত্রের কর্মচারীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না, তাহাদের অসুবিধা বুঝিতে চাহেন না। এইভাবে প্রিন্টার অভিযোগের স্তূপ নিউজ এডিটারের কাছে উপস্থাপিত করে, এবং অশোককে পুনরায় সে রাত্রে চায়। নিউজ এডিটার একটু হাসে—সেই হাসির অর্থ হইল যে, প্রিন্টারের সব কথাই সে অনুমোদন করিতেছে কিন্তু সংস্কারের উপায় নাই।

মাঝে মাঝে দিনের বেলার সহ-সম্পাদকদের মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া যায় রাত্রির নতুন লোকের কাজ দেখিয়া। বিলাতী টেলিগ্রাম লোকাল পেজে ছাপা হইয়া যায়, একই ঘটনার সংবাদ নানা স্থানে ছড়ানো থাকে, টেলিগ্রাম পেজের হেড লাইনে সামঞ্জস্য থাকে না—এই সমস্ত খুঁত সম্পাদক মহলে খুব হাসিরই বস্তু। নিউজ এডিটার মাঝে মাঝে এডিটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিন্তু এইসব সাব-এডিটারের কাজের সঙ্গে সম্পাদক পরিচিত নন—তাই অভিযোগ মানিয়া লইলেও তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন না। তাই তিনি অভিযোগ শোনেন কিন্তু তাহার প্রতিকার করিতে ভুলিয়া যান। অবশ্য না ভুলিয়াও উপায় নাই কুন্তলা দেবীর প্রেরিত লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ মনে রাখিয়া যে লাভ নাই, সে-কথা সম্পাদক জানেন।

কাগজের খুঁতকে নিখুঁত করিতে গিয়া নিজের খুঁতের অঙ্ক বাড়াইতে তিনি প্রস্তুত নন এবং সেই প্রস্তুতিই যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে আজ তাঁহার পক্ষে সম্পাদক হওয়া সম্ভব হইত না। যে-দেশে কাগজের স্বার্থ দেখিলে কাগজের সম্পাদক হওয়া যায় না, সেই দেশের সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়। সংবাদ-পত্রের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিতে গিয়া নিজের ভবিষ্যৎকে ম্লান করিবার চেষ্টা ক্রনিকল সম্পাদক করিতেন না—তাই নতুন নাইট্ এডিটারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজভাবে চলিতে লাগিল এবং প্রিণ্টারের অভিযোগ উগ্রতর হইতে লাগিল।

অশোক ভালছেলে বলিয়া ছাত্রমহলে খ্যাতি ছিল। অশোক ভাবিল যে, শুধু চাকুরী করিয়া নিজের জীবনের বিফলতাকে সে স্বীকার করিবে না। দেশের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ নয়, কিন্তু যে-শাসন শোষণের রূপ ধরিয়া জাতিকে শুষিয়া লইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে এবং আধুনিক কালে কোন কিছু কাজ করিতে হইলেই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সে যুবক সমিতির সভ্য, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য, কিন্তু কোথাও সে ইচ্ছা করিয়াই নিজে কার্য্যভার গ্রহণ করে নাই। ক্রনিকল আপিসের অবহেলা তাহাকে সচেতন করিল যে, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র ভিন্নস্থানে, যদিও জীবনধারণের জন্য কেবল ক্রনিকল আপিসের চাকুরীকেই প্রধান অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতে পারে। সে ভাবিল যে, শোষণের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে হইবে, দেশের যুবশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ

করিতে হইবে ও দেশের জনসাধারণকে নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে! জাতি সংহত ও উদ্বুদ্ধ হইলে তাহার চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রণালী নববিধানের দিকে অগ্রসর হইবে। এই নব বিধানের মূলমন্ত্র তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সে জানে যে, কলিকাতায় যে-সব যুব সমিতি বা সঙ্ঘ আছে, তাহা কোন বিশেষ রাজনৈতিক নেতার আশ্রয়ে প্রতিপালিত বা কোন নেতার বিশেষ মতবাদ সেখানে প্রতিফলিত। কোন বিশেষ নেতার নেতৃত্বকে বজায় রাখিবার জন্য যে-সব সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের নতুন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। তাহাদের আদর্শে যে-নেতার সহানুভূতি থাকিবে, তাহাকেই তাহারা গ্রহণ করিবে! অর্থাৎ সঙ্ঘগুলিকে আদর্শ শাসিত করিতে হইবে—ব্যক্তিশাশিত নয়।

অমিয় অশোকের বিশেষ বন্ধু। অমিয় বড়লোকের ছেলে, নিজে ব্যারিষ্টার। সে আদর্শবাদী এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সে নিজে স্থান করিয়া লইয়াছে। অশোকের বুদ্ধি ও শক্তি সম্বন্ধে অমিয় শ্রদ্ধাবান। অশোক একদিন সকালবেলায় অমিয়র বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল—আর্ল ষ্ট্রীটে তাহার বাড়ী।

অমিয়র বসিবার ঘরে সটান্ সুইংডোর ঠেলিয়া অশোক ঢুকিল। অমিয় সংবাদপত্র পড়িতেছিল, অশোককে দেখিয়া খুসী হইল।

অশোক বলিল, তোমার সঙ্গে দরকার আছে।

অমিয় একটা সিগারেট জ্বালাইয়া কহিল, দরকারী আলোচনা

পরে চলতে পারে, কিন্তু তোমার খবর কি? তুমি তো এখন কোন মিটিংয়েই আসনা।

অশোক কহিল, আমি সেই কাজেই এসেছি। আমাদের একটা নতুন সঙ্ঘ সৃষ্টি করতে হবে। তুমি একথা নিশ্চয়ই মানবে যে, দেশের এমন একটা সময় এসেছে যখন কোন যুবকের পক্ষে নিরপেক্ষ বা দেশের সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা পাপ। এমন সময় ছিল, যখন রাজনীতি ছিল আমাদের বিলাস। কিন্তু আজ প্রত্যেক যুবকের রাজনীতি সম্বন্ধেই সজাগ থাকতে হবে।

অমিয় কহিল, আমি তোমার কথা মানি কিন্তু নতুন সঙ্ঘ সৃষ্টি করার প্রয়োজন মানিনে।

অশোক দৃঢ়ভাবে কহিল, আমি বেশ বুঝেছি যে, আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতির সংজ্ঞা বদলাতে হবে। আমাদের যুব-সমিতির কার্য্যক্রম হলো নেতাদের অনুসরণ করা, তাদের ভলান্টিয়ার যোগানো, তাদের নেতৃত্বের স্বপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং বিরুদ্ধ পক্ষকে বিদ্রূপ করা। আমাদের দৃষ্টি থাকে শাসকবর্গের কর্ম্মপদ্ধতিকে সমালোচনা করা। কিন্তু এখন এমন সময় এসেছে যে আমাদের দৃষ্টির পরিবর্ত্তন করতেই হবে। দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য জাতিকে দুর্ব্বল করছে, জনসাধারণ আজ শোষিত, যুবশক্তি আজ অপচয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট, দেশবাসী আজ প্রতি পদে পদে বঞ্চিত। এই বঞ্চনা ও অপচয়ের দিকে তুমি দৃষ্টি না দিয়ে যদি শুধু শাসকবর্গের শাসননীতির নিন্দায় সমস্ত শক্তি ব্যয় করো, তাহলে সমস্যাকে আমরাই জটিল করে দেবো। আজ

চতুর্দ্দিকের শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে—শাসনের বিরুদ্ধে নয়।

অমিয় কহিল, শাসনও যদি শোষণ হয়?

অশোক চট্ করিয়া কহিল, শোষণ যেখানে, সেখানেই আমরা আঘাত করবো। আজ কার হাতে শাসন ভার যাবে, তা নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকবো না। আমরা এমন শাসন-ব্যবস্থা চাই, যেখানে শোষণের সুযোগ স্বল্প। কিন্তু তুমি জানো যে, আমরা শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের চেয়ে শাসকের পরিবর্ত্তনের দিকে ঝোঁক দেই বেশী। দেশের বুর্জ্জোয়াশক্তি আমাদের দৃষ্টিকে এইভাবে ঝাপ্‌সা করে দিচ্চে। আমরা শাসনযন্ত্রের সাহায্য চাই—তাই শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন কামনা করি।

অমিয় কহিল, অশোক, তুমি জানো যে শাসন যন্ত্রের পীড়ন-শক্তি সবচেয়ে বেশী। তাই শাসনভার দেশবাসীর হাতে যাওয়া চাই।

অশোক সমর্থন করিয়া বলিল, আমি জানি শাসনযন্ত্রের শোষণ-ক্ষমতা বেশী কিন্তু আবার শাসনযন্ত্রের উপরই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বেশী। দেশময় যে-গভীর সমস্যা, তা' কোন ব্যক্তির চেষ্টায় সমাধান হবে না। শাসনভার যাঁরা গ্রহণ করবেন, নির্ভর করবে তাঁদের উপর। আজকের দিনে শাসনযন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দেশের সমস্যা নিবারিত হতে পারেনা—ব্যক্তি বিশেষের দানশীলতার উপর, সঙ্ঘবিশেষের পল্লী-উন্নয়ন কর্ম্মপদ্ধতির উপর নির্ভর করলে তোমার দেশের হাহাকার বাড়বে বই কমবে না।

তাই দেশবাসীর হাতে শাসনভার গেলেই চলবে না, সেখানে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে দেশের দুর্গতদের বেদনা শাসনযন্ত্রকে ইচ্ছামত রূপ দিতে পারে। তা না হলে ভাই, আঘাত যার কাছ থেকেই আসুক, ব্যথা আমাদের সমানভাবেই লাগবে।

অমিয় কহিল, কিন্তু সে-ব্যবস্থা তুমি আমি কি করে করবো!

অশোক কহিল, তাই বলছিলাম যে, নতুন সঙ্ঘ করা দরকার। আমাকে তোমরা বিদ্রূপ করো যে দেশের পল্লীর সংগঠন কাজে আমার শ্রদ্ধা নেই, গবর্ণমেণ্টের দিকে আমার দৃষ্টি ও আশা বেশী। তা' কিন্তু ঠিক্! আমি জানি যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত কোন সমস্যা সহজ হতে পারে না, তাই আমি নতুন চিন্তাধারায় জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে চাই,—তাদের প্রতিনিধি যেন সদস্য সভায় এমন বিধানই কল্পনা করেন যেখানে বঞ্চনা থাকবে না। দেশের সত্যিকার সমস্যার দিকে যদি তোমার দৃষ্টি না থাকে, তাহ'লে শাসনভার তোমার জনপ্রিয় নেতাদের হাতে গেলেও জনসাধারণের ব্যথা তাতে কমবে না। কিন্তু তোমার প্রতিনিধি যদি তোমার বেদনা সম্বন্ধে সজাগ থাকে, শাসনভার যার হাতেই অর্পিত হোক, যন্ত্র তখন তোমার অধীনে। যন্ত্র চলে পেট্রোলের সাহায্যে, চালক উপলক্ষ্য মাত্র।

অমিয় শুধু কহিল, আমাদের যে-যুব-সমিতি আছে, তা' দিয়ে কি তোমার নতুন কাজ চলে না?

অশোক কহিল, চলা মুস্কিল। তুমি জানো আমাদের সমিতি রাজনীতি সমুদ্রের নেতাদের নোঙরের সঙ্গে জড়িত, তাদের অর্থে

পুষ্ট এবং তাদের রীতি ও নীতি সমর্থনে ব্যস্ত। আমাদের নতুন চিন্তাধারা যদি তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে মুস্কিল হবে। আর একথা তুমি জানো যে, নেতারাও শোষণ নীতিরই সৃষ্ট জীব, তার ভিতর ক'জনই বা নিজের স্বার্থ ছেড়ে দুর্গতদের বাণী বহন করতে প্রস্তুত হবে। সর্ব্বদেশের ইতিহাসেই দেখতে পাবে যে, কাজের ভার পড়লে সর্ব্বহারাদের বাণী প্রচারিত হলেও তা প্রাধান্য পায় না ; যদি পায়, আমাদের অভিনন্দন তারা লাভ করবে।

অশোক উত্তেজনায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অমিয় বেহারাকে দুই কাপ চা আনিতে বলিল। চা যখন আসিল, তখন অশোক খুসীই হইল।

তাই হাসিয়া কহিল, কোন বড় কাজ ভাই নেশার সাহায্য না নিলে সম্ভব হয় না। চা আমার কাছে সেই নেশারই কাজ করে।

অমিয় কহিল, চায়ের পরিবেষ্টনের মধ্যেই যেন তোমার নেশা আবদ্ধ থাকে—নইলে দেখবে, নেশা তোমাকে পেয়ে বসবে।

অশোক হাল্‌কা ভাবে বলিল, ভয় নেই, কারণ তোমাদের ধনতান্ত্রিক যুগে বিনা পয়সায় নেশা করা যায় না।

অমিয় একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, খাবার পয়সা না জুটলেও নেশার পয়সা জোটে। আমি ত ভাই বিলেতে লাঞ্চ না খেয়ে অর্থ বাঁচাতেম মদ খাবার জন্য।

—শুধু মদ ?

—ওখানে সন্ধ্যায় মেয়ে সঙ্গীর জন্য মূল্য খুব বেশী দিতে হয় না।

অন্ততঃ তোমাদের দেশের মত নয়। ওরা মূল্যবান, তাই বেশী মূল্য চায় না, আমাদের দেশের মেয়েরা মূল্যহীন বলে বেশী মূল্য চায়।

অমিয় বিবাহ করে নাই, কারণ যে-মেয়েটিকে বিবাহ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, তাহার প্রবাস অবস্থানকালে সেই কন্যার পিতা এক দ্বিতীয় পক্ষ আই, সি, এস-এর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া দিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া অমিয় শুনিয়াছিল যে মেয়েটি প্রথমটা তাহার পিতাকে খুব বাধা দিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; এবং তাহা পারে নাই বলিয়াই অমিয় মেয়ে জাতির উপর চটিয়া রহিয়াছে।

এই ভাবে দুই বন্ধুতে অনেক আলোচনা চলিল। পরে সিদ্ধান্ত হইল যে, তাহারা নতুন সঙ্ঘ করিবে। অমিয় সভাপতি হইবে এবং অশোক সম্পাদক থাকিবে। আপাততঃ যাহা খরচ হইবে, অমিয় চালাইয়া লইবে। পরে কি ভাবে অর্থ জোগাড় করা যায়, অমিয় সেই ভার গ্রহণ করিল। যুব সমিতির সংস্পর্শ আপাততঃ তাহারা ছাড়িবে না, কিন্তু তাহাদের বন্ধু-বান্ধব লইয়া নতুন দল নতুন চিন্তাধারা প্রচারকল্পে গড়িয়া তুলিবে। দেশ নতুন ভাবে ভাবিতে শিখুক, নতুন তথ্য জানুক, রাজনীতির কূট তর্ক ছাড়িয়া অর্থনীতির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হোক, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। অনশনে যাহারা মরে, অন্ততঃ তাহাদের মনে নালিশ জমিয়া উঠুক।

অশোক মেসে ফিরিয়া দেখিল যে, তাহার জন্য "প্রুফ" লইয়া একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করাতে সেই

ভদ্রলোকটি বলিলেন, আমি আপনার গল্পপুস্তকের "প্রুফ" নিয়ে এসেছি।

অশোক বিস্মিত হইয়া কহিল, "কপি" কোথায় পেলেন ?

ভদ্রলোকটি নম্রভাবে বলিলেন, আপনার সমস্ত "কপি" রায়-বাহাদুর অলক দত্তের বাড়ী থেকে পেয়েছি। আমরা বিল্‌ও সেখানেই পাঠাবো, শুধু আপনাকে দিয়ে প্রুফ সংশোধন করাতে বলে দিয়েছেন।

অশোক সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিল এবং ইহাও বুঝিল যে, মাধুরীই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবে। অবশ্য কেহ ব্যয়ভার বহন না করিলে অশোকের বই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। তাহার বই প্রকাশিত হইবে ভাবিয়া অশোক খুসী হইল কিন্তু মাধুরীর অর্থে তাহা প্রকাশিত হইবে, এই কথা সে কখনও ভাবে নাই। অশোক প্রুফ রাখিয়া ভদ্রলোকটিকে বিদায় দিল। ভদ্রলোকটি তাহার প্রেসের ঠিকানা দিয়া চলিয়া গেলেন।

অশোক খাওয়া শেষ করিয়া মাধুরীর বাসার দিকে রওনা হইল। ইবকালেই আপিস—বুঝিল মাধুরীদের বাড়ীতে যাইলে আপিসে যাইতে বিলম্ব হইয়া যাইবে। তাহা হউক, অশোকের আপত্তি নাই—আপিসের কাজের প্রতি অহেতুক মমতা জাগিবার তাহার কোন হেতু ঘটে নাই।

সাধারণতঃ অসময়ে সে মাধুরীদের বাড়ীতে যায় না। হঠাৎ বই প্রকাশ হইবার উত্তেজনায় অশোক সময়বোধকে অস্বীকার করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। নীচের বারান্দায় অনিতা

দেবীর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি অশোককে দেখিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন, তোমাকে সংবাদ দেব ভাবছিলাম। মাধুরীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—এই মাসের ভিতরই হবে। ছেলেটি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে।

অনিতা দেবী এক নিঃশ্বাসে সমস্ত সংবাদ দিয়া গেলেন। ছেলেটিকে অনিতা দেবীর পছন্দ হইয়াছে। প্রথমটা তাঁহার মনে একটু সঙ্কোচ ছিল, কারণ ছেলেটি বিলাত ফেরত নয়। যে সমাজের দিকে অনিতা দেবীর ঝোঁক ও দৃষ্টি, সেই সমাজে বিলাত ফেরত না হইলে স্থান পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে, ছেলেটির মাত্র একটি বোন এবং তাহার আর কোন ভাই নাই, তখন তিনি খুসী হইলেন। ছেলেটির পিতা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মারা গিয়াছেন। সব অর্থই ছেলের জন্য গচ্ছিত এবং বোনটিরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বড় সংসারে মেয়েকে বিবাহ দিবার ইচ্ছা অনিতা দেবীর ছিলনা। তাই এই ক্ষুদ্র অর্থবান সংসার পাইয়া তিনি বিলাত ফেরতের জন্য অত্যধিক দাবী জানান নাই।

মাধুরী বিবাহে সম্মতি না জানাইলেও রূঢ়ভাবে আপত্তি জানায় নাই।

অশোক যে উৎসাহ লইয়া আসিয়াছিল, তাহা যেন নিবিয়া গেল। নিবিয়া যাইবার কোন কারণ ছিল না, কারণ মাধুরীর বিবাহ হইবেনা, এই কল্পনা সে কখনও করে নাই। সে নিজে বিবাহিত—সে এই কথাও জানে যে, মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেলে

তাহার জীবনের জটিলতা বরঞ্চ দূরীভূত হইবে। তবুও যেন অশোক মাধুরীর বিবাহ-সংবাদ শুনিয়া খুশী হইল না। মনে হইল যে মাধুরীর বিবাহ যেন তাহার পক্ষে ক্ষতিকর।

অশোক হাসিয়া কহিল, মাসীমা, এই শুভ সংবাদের জন্য আমার বকশিশ পাওনা রইল।

অনিতা দেবী মুচকি হাসিয়া কহিলেন, বকশিশ পাবে। তুমি যা' চাও, আমি মাধুরীর বিয়েতে তোমাকে তা-ই দেব।

অশোক একবার বলিতে চাহিল যে মাধুরীর বিবাহ না দিলেই হইবে তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কিন্তু সেই পুরস্কারের কথা বলিল না। শুধু হাসিয়া কহিল, আমার বকশিশের নমুনা পরে জানাবো।

অনিতা দেবী কহিলেন, তুমি মাধুরীকে একটু বুঝিয়ে বলো।

অশোক কহিল, ছেলেটির কি নাম? ছেলেটির সঙ্গে মাধুরীর আলাপ হয় নি?

—ছেলেটির নাম অমিতাভ বসু। মাধুরীর সঙ্গে একদিন আলাপ হয়েছে।

—মাধুরীর পছন্দ হয়েছে?

—নিশ্চয়ই হবে, ছেলেটি যে দেখতে বেশ!

এই কথা বলিতে বলিতে দুইজনেই দোতালায় উঠিল। মাধুরী খোলা চুলে বারান্দায় ইজিচেয়ারে একটা মাসিক পত্র পড়িতেছিল! মা ও অশোককে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অশোককে এই সময় দেখিয়া মাধুরী সত্যই একটু আশ্চর্য্য হইল, একবার ভাবিল যে মা হয়তো সংবাদ দিয়া আনাইয়াছেন।

অনিতা দেবী মাধুরীকে অশোকের সঙ্গে আলাপ করিতে বলিয়া নিজে চলিয়া গেলেন। মাধুরী ও অশোক মাধুরীর পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল।

অশোক হাসিয়া বলিল, তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

মাধুরী চোখ বাঁকা করিয়া কহিল, বাঙালী মেয়ে বিয়ে করবে, তাতে অভিনন্দনের কোন হেতু নেই। আর আমার বিয়ে যে, তোমার কাছে এত অভিনন্দনের বস্তু ছিল, তা' আমি জানতেম না।

অশোক খোঁচাটুক উপভোগ করিল। হাসিয়া কহিল, মধু, তোমার নতুন জীবন মধুময় হোক!

মাধুরী মুখ নীচু করিয়া কহিল, তোমরা যত সহজে আশীর্ব্বাদ করতে পারো, আমরা যদি তত সহজে ভুলতে পারতাম, আমাদের সমস্যা অনেক সহজ হতো।

অশোক ব্যথা পাইল, ব্যথা বুঝিল কিন্তু তবুও হাসিল। হাসিয়াই কহিল, যাকে বিস্মরণের পথে বিদায় দিতে হবে, তা'কে স্মরণপথে জাগ্রত করে রাখা পুরুষের ধর্ম্ম নয়।

মাধুরী কহিল, যাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র অবিশ্বাস, তারা কেন আমাদের মনে বিশ্বাস জাগায়?

মাধুরীর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

অশোক কহিল, ভুল বুঝোনা মধু, বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে পারি কিন্তু সেই মর্য্যাদা তোমাদের রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই তোমার নতুন জীবন গ্রহণের পূর্ব্বে তোমায় অভিনন্দন

জানাই। জানি, নতুনকে গ্রহণ করতে পুরাণো গ্রন্থিকে আলগা করতে হয়। আমার স্মরণের কৌটায় তোমার গ্রন্থি অটুট থাকবে, ব্যবহারিক জগতের দূরত্ব থেকে তার বিচার করো না। তোমার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখবো বলেই তোমাকে বিদায় দিচ্ছি। তুমি যা রেখে যাবে, তা' আমার সম্পদ হ'য়ে আছে—সেই ধনে আমি ধনী।

মাধুরী বলিল, অশোকদা, তুমি জানোনা হয়তো যে, যে-গ্রন্থী আটকে গেছে, তাকে আলগা করা কি বিষম দায়!

অশোক কহিল, কিন্তু এই-তো সংসার! যে-বন্যা দেশ ধুয়ে নিয়ে যায় সেই বন্যা ভূমিকে উর্ব্বর করে দেয়। ধ্বংসলীলার এই নিহিত সৃষ্টি-শক্তি না থাকলে মানুষের অশ্রু ব্যর্থ হ'তো, জীবন অসহনীয় হ'য়ে উঠতো।

—কিন্তু তা' বলে বন্যায় যে ক্রন্দনের রোল ওঠে, তা'তো অসত্য নয়। আমার প্রাণে আজ সেই আর্ত্তনাদ—তাই চমকে উঠি, অস্থির হই এবং সবাইকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে।

—এই অশ্রু মূল্যহীন নয়। যে ব্যথা পায়, সে ব্যথার দাম দিতে জানে। ব্যথার দাম দিতে যে না জানলো, না শিখলো, তার কাছে সব কিছু মিথ্যা, মানুষকে সে পায় না। তুমি যাকে পাবে, তাকে যেন অন্তরলোকেও পাও, এই কামনাই করি।

মাধুরী তাহার ডান হাতের অনামিকা হইতে আংটি খুলিয়া অশোকের বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিল। এবং

তাহার পর অশোকের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। অশোক নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল—নিষেধ করিতে পারিলনা, নিষেধ করিবার অবসরও পাইল না।

প্রণাম করিয়া মাধুরী কহিল, আশীর্ব্বাদ করো, অশোকদা, জীবনে যা কিছু পেয়েছি, তাকে অবহেলা না করে যা পাবো, তা' যেন প্রণামের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি। যা' পাইনি, তার জন্য যেন বেদনা না পাই, অন্তরের সেই শূন্যতা যেন জীবনের অনতিক্রান্ত পথে বাধা সৃষ্টি না করে।

তারপর হাসিয়া কহিল, আমার আংটি রইল তোমার হাতে, তাতে তোমার চলার পথ সহজ হবে।

অশোক নিজের অঙ্গুলির দিকে তাকাইয়া আংটিটি দেখিল। বলিল, এই স্মরণচিহ্নের মর্য্যাদা যেন রাখতে পারি!

মাধুরী ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল যে দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। সে বলিল, চলনা অশোকদা, সিনেমায় যাই।

অশোক যেন অপরাধীর মত বলিল, আমার যে আপিস আছে।

মাধুরী কহিল, আজ যেন খুব ইচ্ছে হয়েছে তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে।

অশোক বুঝিল যে, মাধুরীর ইচ্ছাকে সে অস্বীকার করিতে পারেনা—বিশেষতঃ আজকের দিনে। তাই সে সম্মত হইল। তবুও একবার বলিল, আপিসে একটা সংবাদ দেওয়া উচিত ছিলো।

মাধুরী হাসিতে হাসিতে চৌকি ছাড়িয়া উঠিল। বলিল, আমি ফোন করে বলে দিচ্ছি। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

মাধুরী ফোন করিয়া, মায়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, নিজের পোষাক বদলাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দে সে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, তাই খুব সাধারণ সজ্জায় প্রস্তুত হইয়া আসিল। হাতঘড়িটা লাগাইতে লাগাইতে বলিল, যদি সিনেমায় তোমার আপিসের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়?

অশোক হাসিয়া কহিল, ওরা হিংসায় পড়ে যাবে।

মাধুরী চট্ করিয়া কহিল, তাহলে আমাকে নিয়ে বের হলে অনেকের বিপদ আছে।

বলিয়াই থামিয়া গেল—তাহার চোখমুখ রক্তের আভায় লাল হইয়া উঠিল। অশোক হাসিল, কোন উত্তর দিবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

মাধুরী তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া ডাকিয়া শোফারকে মোটর প্রস্তুত করিতে বলিল। অশোকও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল। গাড়ীতে উঠিয়া মনে হইল যে, তাহারা কোন্ সিনেমাতে যাইবে তাহা ঠিক করা হয় নাই। কোথায় কোন্ পিক্চার আছে, তাহাও কেহই জানেনা। মাধুরী ড্রাইভারকে বলিল, গ্লোবে চল।

অশোক বলিল, তুমি আমার গল্পের বই ছাপতে দিয়েছ, এ-কথাতো বল নি।

মাধুরী কহিল, এতে অনুমতি নেবার কি আছে। গল্প লিখেছ,

তা' ছাপা হবে। যে গল্পগুলি আমার ভাল লেগেছে, আমি সেগুলিই ছাপতে দিয়েছি।

—ক'টা গল্প নিয়েছ ?

—ন'টা।

—খরচ কত পড়বে ?

—অত হিসেব করলে বই ছাপতে দেওয়া যায়না। তবে, আমার নিজের হাতে যা' টাকা আছে, তাতে কুলিয়ে যাবে।

—কিন্তু যদি বিক্রী না হয় ?

—আমি কি বইয়ের ব্যবসা করতে বসেছি !

এইভাবে ছোট খাটো কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল।

ম্যোবে দুইজনে সিনেমা দেখিল। বইখানা ভাল লাগিলনা—কিন্তু সিনেমা দু'জনেরই ভাল লাগিল। সিনেমার পর তাহারা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেল। বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মাধুরীর সখ হইল যে, এই সন্ধ্যায় গঙ্গাবক্ষে সে নৌকায় বেড়াইবে। মাধুরী মফঃস্বলে থাকিতে সাঁতার শিখিয়াছিল, সেই সাহসে নির্ভর করিয়া সে এই প্রস্তাব করিল। অশোক আপত্তি করিলনা। আজ তাহার হৃদয়বীণা যে তন্ত্রীতে বাঁধা, তাহাতে বেসুরা তান আসিবার সম্ভাবনা কম।

গঙ্গাবক্ষে একটি ছোট খোলা নৌকায় তাহারা বেড়াইতে লাগিল। নৌকাচলার ছল্‌ছল্‌ শব্দ, অদূরে কলিকাতানগরীর আলো, দু'একটা ষ্টীমলঞ্চ-এর যাতায়াত, বড় বড় নৌকার ধীর মন্থর গতি, সন্ধ্যার হাওয়া, উপরে সন্ধ্যার তারকারাজি—

এমন সময় মানুষের মন একটু অবসন্ন হইয়া পড়ে, অন্তর "লিরিসিজম"এর তালে ছন্দোবদ্ধ হইয়া যায়, গভীর আনন্দ বা দুঃসহ বেদনা মানুষ এখনই ভোগ করিতে বা সহিতে পারে। অনাগত প্রিয়জনকে পাইবার পূর্ব্বে আগত প্রিয়জনের সঙ্গে মানুষ এই সময় মরিতে পারে, ডুবিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে পালাইতে পারে। মাধুরীর অনাস্বাদিত যৌবনের সৌরভে মাধুরী নিজেই মুগ্ধ হইল এবং সেই সৌরভ অশোককেও মোহাবিষ্ট করিল। এমন সন্ধ্যায় এমন অবস্থায় নিস্তব্ধতারও ভাষা আছে, তাই মাধুরী মৌন থাকিয়া অশোকের পাশ ঘেঁসিয়া বসিল। অশোক তাহার বাম হাতখানি ধরিল। এমন সময় একটা ষ্টীম-লঞ্চের ঢেউতে নৌকাখানা দুলিয়া উঠিল—মাধুরী অশোকের গায়ের উপর গিয়া পড়িল। মাধুরী লজ্জাবোধ করিল না—শুধু বলিল, যদি নৌকা ডুবে যায়?

অশোক মাধুরীকে আদর করিয়া কহিল, তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি আমার আছে। আর যদি ডোবেই, দুজনেই ডুবে মরব।

মাধুরী কহিল, কিন্তু এমন সন্ধ্যা কি ডুবে মরবার জন্য?

অশোক কোন কথাই বলিলনা—শুধু আকাশের দিকে চাহিল।

যখন তাহারা ঘাটে ফিরিয়া আসিল, তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

মাধুরী অলসভাবে বলিল, চল, অশোকদা বাড়ী যাই।

বাড়ী ফিরিবার সময় মাধুরী অশোককে তাহার মেসে নাবাইয়া দিয়া গেল।

মাধুরী যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার পিতা ও মাতা উৎকণ্ঠ হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাধুরীকে দেখিয়া তাঁহারা কিছুই বলিলেন না, শুধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

নয়

অশোকের কাজ অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের নতুন সঙ্ঘ গড়িতে অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা সহিতে হইতেছে। কিন্তু তাহাদের উৎসাহ-দীপ নির্ব্বাপিত হইতেছে না। অমিয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। তাহাদের অনেকে কম্যুনিষ্ট বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। তাহারা মানুষকে বঞ্চিত হইতে দিতে চায় না। প্রতারণার বিস্তৃত সুযোগকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতে চায়, দারিদ্র্যের পীড়ন হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে চায়—ইহা যদি কম্যুনিজম হয়, তাহা হইলে তাহাদের কম্যুনিষ্ট হইতে আপত্তি নাই। কিন্তু অশোক শোষণকে ঘৃণা করে, এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা কামনা করে। সে কম্যুনিজম চায়, অন্ততঃ সেই ব্যবস্থা চায় না যেখানে স্বাধীনতা নাই। শোষণের পথকে বন্ধ করিতে যাইয়া শাসনযন্ত্রের পীড়নের পথকে সে সুবিস্তৃত করিতে চায় না। অশোকের সঙ্ঘ ক্রমশঃই নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল—কারণ তাহারা পুস্তিকা ছাপাইল, নানা জেলায় কর্ম্মী পাঠাইল, খবরের কাগজের সাহায্যে তাহাদের নীতি প্রচার করিতে লাগিল। তাহাদের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে প্রিয় হইল।

মাধুরীর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে—তাহাতে অশোক একটু উতলাই হইয়াছে। এদিকে তাহার গল্পের বইয়ের প্রুফ দেখিতে হইতেছে। শোভনা শ্যামবাজারে—সেখানেও মাঝে মাঝে তাহাকে যাইতে হইতেছে। আর্থিক দুর্গতিও সমান ভাবে চলিতেছে। আপিসের মাহিনা সে ধীরে ধীরেই পায় কিন্তু খরচের গতি তাহার দ্রুততর তালেই চলে।

নানাবিধ কর্ম্মের নেশায় দিনগুলি কাটিয়া গিয়া মাধুরীর বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইদিন ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই অশোকের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল যে, আজ মাধুরীর বিবাহ। সে আপিস হইতে ছুটি লইয়াছে—অথচ তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাধুরীদের বাড়ীতে যাইবে, সেই উৎসাহ যেন অশোক হারাইয়া ফেলিয়াছে। হঠাৎ মনে পড়িল যে, শোভনার কাছে তাঁহার যাইতে হইবে। শোভনা বারবার সেইদিন যাইতে বলিয়া দিয়াছে। ইহাও সে ভাবিল যে, এই সকাল বেলায় তাহারা শ্যামবাজার যাইবে—দশটার পরে প্রেস খুলিবে, সেখান হইতে আজ তাহার গল্পের বই আনিতে হইবে। প্রেসকর্ত্তা অঙ্গীকার দিয়াছেন যে, অন্ততঃ দুই কপি তিনি আজ তাহাকে দিবেন। গল্পের বইয়ের নাম দিয়াছে, "মায়ামৃগ"। এই কথা ভাবিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। হাত মুখ ধুইয়া জামাটা গায়ে দিল। মনে পড়িল যে, কাল আপিস হইতে দশটা টাকা আনিয়াছে মাধুরীর জন্য উপহার কিনিতে—তাহাও আজ সকালের ভিতর কিনিয়া লইতে হইবে। এতো কাজ, অথচ সময়ের এতো

অভাব। আবার মাধুরীদের বাড়ীতে তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে।

শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছিয়াই অশোকের প্রথম দেখা হইল শোভনার সঙ্গে। শোভনা হাসিয়া অশোককে গ্রহণ করিল। তারপর ময়না ছুটিয়া আসিল। ময়না বলিল, জামাইবাবু, আজ আমাদের সিনেমা দেখান—এখানে ভাল ছবি আছে।

অশোক হাসিয়া কহিল, ছোট মেয়েদের সিনেমা দেখা উচিত নয়।

ময়না নিরুৎসাহ হইয়া বলিতে লাগিল যে, তাহার স্কুলের বন্ধুরা অনেকেই সিনেমা দেখিয়াছে। ইহার দ্বারা সে প্রমাণ করিয়া দিল যে সিনেমা দেখা ভাল।

শোভনা ময়নাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আচ্ছা তোকে আমি দেখাব।

ময়না আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে বৌদিকে বলিতে চলিয়া গেল।

শোভনা বলিল, এখন তোমার দিনের কাজ। নতুন বাসা করে আমায় নিয়ে যাও, এখানে ত অনেক দিন থাকা হ'ল।

অশোক বলিল, দিনের কাজ পেয়েছি বটে কিন্তু অর্থ সমস্যা কিছুই সহজ হয়নি।

শোভনা হাসিয়া কহিল, সমস্যা যখন থাকবেই, তাকে স্বীকার করেই নতুন বন্দোবস্ত করব। কি ভাবে চলবে, সে-ভার আমি গ্রহণ করব।

শোভনার অবলম্বন হইল তাহার দাদার গোপন সাহায্য। অশোক বলিল, আজকাল একটু কাজে ব্যস্ত আছি—এই কাজটা একটু কমলেই নতুন বাসা দেখবো।

শোভনা কহিল, তোমার কাজ কমবে না, তা' আমি জানি। তুমি যদি এদিকে থাকো, আমি দাদাকে বলে ঠিক করতে পারি।

অশোক মাথা নাড়িয়া বলিল, উত্তর কলকাতায় বিয়ে করা চলে কিন্তু থাকা চলে না। থাকতে হ'লে দক্ষিণের হাওয়া ও দাক্ষিণ্যপূর্ণ দৃষ্টি—দুই-ই প্রয়োজন।

শোভনা গম্ভীর হইয়া কহিল, দক্ষিণের হাওয়া এখানেও পাবে কিন্তু দাক্ষিণ্যপূর্ণ দৃষ্টি মিলবে না। আমার দৃষ্টিতে তো তোমার মন ভরবে না।

অশোক হাসিল।

শোভনা বলিল, এখানে আমার অনেক খরচ হয়ে গেছে। এতদিন পরে এসেছি, তাই দাদার ছেলেমেয়েদের জামা কাপড় কিনে দিতে হয়েছে। ময়নার নতুন রকমের এক জুতার সখ ছিল, তা-ও কিনে দিয়েছি। বৌদিরা সিনেমা দেখতে চান—আমি বলেছি, নিয়ে যাব। তাই তোমাকে দশ টাকা দিয়ে যেতে হ'বে।

অশোক অন্যমনস্কভাবে বলিল, এতো খরচ না করলেই হ'তো।

—যতদিন পরে এলে কিছু খরচ হ'বেই। আর যা' খরচ করেছি, তার অনেক বেশী নিয়ে যাবো। দাদা তোমার জন্য একখানা কাশ্মীরি শাল কিনে এনেছেন—আর আমাকে ত' সুটকেস্ ভরে' জামা কাপড় দিয়ে দেন-ই। এতোটা যেখানে পাই,

কিছু খরচ না করলে তোমার দিক থেকে ভাল দেখায় না। তোমার ছেলে কি মেয়ে থাকলে, কত পেতো দেখতে। মা-তো তাঁর গয়না রেখে দিয়েছেন। আমার প্রথম মেয়েকে দিয়ে যাবার জন্য।

অশোক হাসিল, শোভনার দিকে তাকাইল। দেখিল, শোভনার মুখে শ্রী বাড়িয়াছে, দেহের ক্লান্তি দূর হইয়াছে, চোখের অবসন্ন ভাব আর নাই। শোভনা তন্বী হইলেও আবার স্বাস্থ্য যেন ফিরিয়া পাইয়াছে। অশোক খুসী হইল। মনে পড়িল যে, মাধুরীর বিবাহ—তাহার পকেটে দশ টাকা আছে, কিন্তু তাহা মাধুরীর জন্য উপহার কিনিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। যদি তাহা শোভনাকে দেয়, কোন "উপহার" তাহা হইলে কেনা হয় না। অশোক মুস্কিলে পড়িল।

অশোক কহিল. তোমার মেয়ে তার দিদিমার সম্পত্তি পাবে, তাতে তোমার মেয়ের বাবার অর্থ-সমস্যার কোন সমাধানই হ'বে না। বরঞ্চ জটিলতর হ'বে।

—মানুষের জীবনে অর্থই তো একমাত্র বস্তু নয়। অর্থবান লোকই জীবনকে পুরোপুরি ভোগ করতে পারে, তার কোন প্রমাণ নেই।

—হয়তো নেই। কিন্তু অর্থ না থাকলে জীবনের সম্ভোগ-রাশি অপরিবেশিত থেকে যায়।

—তোমার দারিদ্র্য সম্বন্ধে তুমি এতোটা সচেতন থাকো যে জীবনের আনন্দ-রস গ্রহণ করা তোমার পক্ষে মুস্কিল। নইলে,

কুটিরেও হাসির অভাব হয় না। ঐশ্বর্য্যের পথই একমাত্র শান্তির পথ নয়।

শোভনা অশোককে সান্ত্বনা দিবার জন্যই এই সব কথা বলিল।

অশোক খুসী হইল। সে কোন বিতর্ক না করিয়া পকেট হইতে দশ টাকার নোট শোভনার হাতে দিল।

শোভনা টাকাটা গ্রহণ করিয়া বলিল, তোমার কোন অসুবিধে হ'বে না তো?

অশোক কহিল, খরচ হ'লে সব সময়ই অসুবিধে হয়। তবে, তোমার প্রয়োজনে লাগবে, সেই প্রয়োজনের খাতিরেই দিলাম।

শোভনা বলিল, তুমি না দিলে আমি কোথায় পাব।

শোভনা তারপর নূতন বাসা করিবার জন্য অনুরোধ করিল—বলিল যে, তাহার আর শ্যামবাজারে থাকিতে ভাল লাগিতেছে না।

অশোক কহিল, তোমার শরীর কিন্তু ভাল হয়েছে।

শোভনা হাসিয়া বলিল,তাতে আমার চেয়ে তোমার লাভ বেশী।

অশোক চুপ করিয়া রহিল। সহসা বিনীতা দেবীর কথা মনের কোণে উঁকি মারিল। মন আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। মাধুরীর কথা মনে পড়িল—মন হাসিতে ভরিয়া উঠিল। শোভনার দিকে তাকাইল—অশোকের শূন্য দৃষ্টি শোভনার ভাল লাগিল না।

শোভনা বলিল, চল, বাবা মার সঙ্গে দেখা করবে। বৌদির সঙ্গে দেখা করে যেও—তা' না হ'লে আমাকে অনেক কথা শুনতে হ'বে।

অশোক উপরে গিয়া সবার সঙ্গেই দেখা করিল এবং শোভনার কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। শোভনাকে দেখিয়া আজ অশোকের ভাল লাগিল, মনে হইল যে শোভনা বিরহে থাকে ভাল। অনেক স্ত্রীরা যে বিরহেই শান্তি পান, সে-কথা অশোক জানিত এবং এই কথাও জানিত যে, সেই কথা স্ত্রীরা স্বীকার করেন না।

অশোকের কাছে মাত্র চার আনা পয়সা আছে। সে ট্রামে উঠিল প্রেসে যাইবার জন্য। বউবাজারে প্রেস, সেখানে গিয়া তাহার সদ্যপ্রকাশিত গল্পপুস্তকের দুই কপি তাহার লইতে হইবে। এক কপি মাধুরীকে দিবে, এবং এক কপি নিজের কাছে রাখিবে। প্রেসে গিয়া দেখিল যে, তখনও মালিক আসেন নাই। অপেক্ষা করিতে লাগিল, যদিও অপেক্ষা করিবার সময় তাহার ছিল না। কিছুক্ষণ পরে দেখিল যে প্রেসের মালিক পাঁচখানা বই হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তিনি অশোককে দেখিয়া কহিলেন, মাপ করবেন। দপ্তরীর বাড়ী থেকে বই আনতে দেরী হয়ে গেল।

বই পাইয়া অশোক খুসী হইল। তাই বলিল, তবুও যে আপনি এনেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। আজকে আমার বইয়ের বড় প্রয়োজন ছিল।

অশোক চারখানা বই লইয়া চলিয়া গেল। মেসে যখন সে উপস্থিত হইল, সকাল বেলার সমস্ত ঘণ্টাগুলি বাজিয়া গিয়াছে। অশোক তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া নিল। ভাবিল যে, দুপুরেই মাধুরীদের

বাসায় যাইবে। কিন্তু সে যখন তক্তপোষে বসিয়া তাহার "মায়া-মৃগ" দেখিতে লাগিল—মনে হইল যে, তাহার মাথা ঘুরিতেছে। তাই সে শুইয়া পড়িল। অশোক ভাবিতে লাগিল যে, মাধুরীকে কোন উপহার দেওয়া হইল না—সে এই "মায়ামৃগ" বিবাহের দিনে তাহার হাতে তুলিয়া দিবে। যদিও মাধুরীর অর্থে এই বই প্রকাশিত, তবুও বইয়ের গ্রন্থকার সে এবং বইয়ের ভিতর যে-রস ও কথা পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা তাহার নিজস্ব। এইভাবে সে অনেক কিছু ভাবিতে লাগিল এবং কখন কোন অতর্কিত মুহূর্ত্তে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন সে জাগিল, দেখিল মাধুরী একা তাহার সম্মুখে উপস্থিত।

তাহার বুকের উপর "মায়ামৃগ" ছিল—সে তাহা পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, মধু, তুমি এখানে!

মাধুরীর শুষ্ক মুখ, মনে হ'ল যে একটু মলিনও দেখা যাইতেছে। বিমর্ষ মুখে মাধুরী কহিল, আজকের দিনে তুমি আমাদের ওখানে গেলে না। সারা সকাল আমি অপেক্ষা করেছি, আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। আজ তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে যে আমি নতুন জীবনে ব্রতী হ'তে পারিনা। তুমি তো সবই জান।

অশোক নিজের অপরাধ বুঝিল এবং অপরাধীর মত চুপ করিয়া রইল। সে তাহার "মায়ামৃগ" বইখানা নিঃশব্দে মাধুরীর হাতে তুলিয়া দিল। মাধুরী বইখানা পাইয়া ব্যগ্রসহকারে দেখিতে লাগিল। বলিল, তোমার বই এর মধ্যে ছাপা হ'য়ে গেল!

হঠাৎ মাধুরী চমকিয়া গেল। তারপর বলিল, তুমি আমাকে বই উৎসর্গ করতে গেলে কেন ?

অশোক কহিল, তোমার বিয়েতে এই আমার উপহার। তাই আজকের দিনে বইখানাকে প্রকাশ করলাম।

মায়ামৃগের উৎসর্গ পত্রে শুধু লেখা ছিল—মধুকে দিলাম। মাধুরী বইখানা বন্ধ করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। তারপর বলিল, এই উপহারই হ'বে আমার শ্রেষ্ঠ উপহার। তোমার অন্তর এই উৎসর্গের ভিতর আমার কাছে চিরকালের জন্য খোলা রইল।

অশোক যেন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

মাধুরী বলিল, আজকে আমার বাইরে আসতে হয় না, তবুও আসতে হ'লো। আমি এখন যাই, তুমি আমাদের বাসায় যাবে। যতশীঘ্র পার, যাবে। বাড়ীতে এতো লোক কিন্তু তুমি সেখানে নেই! এ যেন আমার ভাল লাগে না। আশা করি, তুমি সব বুঝবে।

মাধুরী বইখানা হাতে করিয়া বাহির হইল। অশোক নীচের রাস্তা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় মাধুরী একবার অশোকের দিকে তাকাইল। মাধুরী হাসিতে চেষ্টা করিল। ক্লান্তমুখে হাসির রেখা না ফুটিয়াই মিলিয়া গেল।

অশোকের দেহ ও মন অবসন্ন। মাধুরীর ক'নে-মূর্ত্তি তাহাকে আরও অবসন্ন করিয়া দিয়া গেল। সে আবার উপরে গিয়া শুইয়া পড়িল। নিজের মন যখন পরের কাছে গচ্ছিত থাকে, মানুষ এমনই অসহায় হইয়া পড়ে। অথচ পৃথিবী যে দ্রুততালে

চলিয়া যায়, তাহার চাকায় কত অসহায় মন নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তাহার খোঁজ কেহ রাখে না এবং রাখিতে চেষ্টা করিলেও পারে না।

অশোক যখন মাধুরীদের বাসায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ীটা ও সম্মুখস্থ লন নানা রঙের বিজলী আলোতে ঝলমল করিতেছে। পথে মোটর গাড়ীর সারি পার হইয়া অপরাধীর মত সে বাড়ীতে ঢুকিল। সুসজ্জিত লনে প্রচুর ভীড়। কেহ ব্যস্ত, কেহ গল্প করিতেছে। একদিকে মেয়েদের জটলা চলিতেছে, সেইদিক হইতে সঙ্গীতের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। চতুর্দ্দিকে যেন এক বিলাসের তরঙ্গ, অসংখ্য নর-নারী তাহাতে ভাসিয়া চলিতেছে। সেই তরঙ্গে ভাসিয়া চলিতে অশোক পারে না, তাই সে আঘাত পায়। মনে হইল যেন সখের মেলা বসিয়াছে—যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা হয় ভুলাইবেন, নয় ভুলিবেন। এই দেওয়া-নেওয়ার খেলায় যতটুকু অভিনয়ের প্রয়োজন, সেখানে তাহার অভাব ছিল না। তাই কণ্ঠে-কণ্ঠে মিলিয়া যে-ধ্বনি সেখানে উঠিল, তাহা অশোকের কাছে অসহনীয় মনে হইল। চতুর্দ্দিকের সেই একই পর্দ্দার সুর তাহাকে বেতাল করিয়া দিল। অশোক সাহস করিয়া আর একটু ভিতরে ঢুকিল। বুঝিল, বর-পক্ষ তখনও আসে নাই। সবাই উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নারীদের ভিতর চাঞ্চল্য, চোখ-ইসারা, থাকিয়া থাকিয়া সঙ্গীতধ্বনি, অহেতুক হাসি এবং অকারণ পুলক অপেক্ষার ক্লান্তিকে দূর করিতেছে।

এমন সময় ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল—অদূরে সানাই যেন কাঁদিয়া উঠিল। দোতালা হইতে মেয়েদের উলুধ্বনির অস্পষ্ট শব্দ আসিয়া পৌঁছিল। গানের বিপরীত দিকে রেডিও ছিল, তাহাতে গান বাজিয়া উঠিল। নারীমহলে যে সঙ্গীত চলিতেছিল, তাহা আবার আরম্ভ হইল। ছোট ছোট মেয়েদের হাত হইতে বেলফুলের মালা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এক লহমায় যেন বিলাসের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল—যে তর্‌তর্ শব্দে স্রোত চলিতেছিল, তাহাতে যেন পাঁকের সৃষ্টি হইল। অশোক বুঝিল যে বর আসিয়াছেন! ভাল করিয়া বরকে দেখিল, তারপর ধীরে ধীরে ফটক্ দিয়া অলক্ষিতভাবে সে বাহির হইয়া গেল। তাহার কাছে সবই যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইল। তাই তাহার পক্ষে সেখানে থাকা অসম্ভব হইল।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল যে, তাহার কোন কিছু করিবার নাই। সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। সে কোথায় যাইবে জানে না, কেন সে হাঁটিতেছে, তাহাও জানে না। তবুও চলার গতিতে যেটুকু নেশা আছে, তাহাই তাহাকে পাইয়া ধরিল। সে চলিতে লাগিল। সে জীবনপথেও এই রকম উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাই আজিকার লক্ষ্যহীন গতিতে সে আশ্চর্য্য হইল না। শুধু বিস্মিত হইল এই ভাবিয়া যে, মাধুরীর বিবাহের রাত্রে তাহাকে পথপ্রান্তে এমনি লক্ষ্যহীনভাবে চলিতে হইবে। এই কথাটা সে ভাবে নাই। অথচ তাহার উপায় নাই। বুঝিল

যে, সে যতই চলিতেছে, মাধুরীদের বাড়ী হইতে ততই সে দূরে সরিয়া যাইতেছে। তবুও সে চলিতেছে।

কলিকাতার পথের জনতা তখনও কমে নাই। কিন্তু অশোক আজ চায় নির্জ্জন পথ, নিঃসঙ্গভাবে চলিতে নিরুদ্দেশের পথে। তাই সে চৌরঙ্গী পার হইয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল, তারপর ইডেন গার্ডেনকে পাশে রাখিয়া ষ্ট্রাণ্ডের দিকে চলিল। ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া চলিতে চলিতে সে হঠাৎ হাওড়ার পুলের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুল পার হইয়া ষ্টেশনে আসিয়া একটি বেঞ্চের উপর বসিল। সে ক্লান্তিবোধ করিল। এতোটা পথ সে কোনদিন হাঁটে নাই, বোধ হয় এতোটা উত্তেজনাও তাহার অন্তরে কোনদিন জমাট বাঁধে নাই। অবসন্ন চিত্তে ক্লান্তদেহে হাওড়ার ষ্টেশনে বেঞ্চে বসিয়া মাধুরীর বিবাহরাত্রির উৎসব স্মরণ করিয়া সে ষ্টেশনের লোক চলাচল লক্ষ্য করিতে লাগিল। কতলোক আসে যায়, কত ক্ষিপ্রতা, কত যেন প্রয়োজনীয় কাজ!—কেন, সংসারে এতো ব্যস্ততা! কোন কিছুরই তো দরকার নাই! অন্ততঃ সংসার যাহাদের কাছে মধুময় নয়, সংসারযাত্রা যাহাদের কাছে আকর্ষণের বস্তু নয়, অথবা সংসারে যাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার প্রলোভন নাই। তবুও সংসার চলে, লোকে বাঁচিতে চায়—এই রহস্য ষ্টেশনযাত্রীদের চলা-ফেরা দেখিয়া অশোকের মনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অশোক একটু হাসিল, মায়াহীন সংসারের এতো বিচিত্র মায়া দেখিয়া অশোক বিস্মিত হইল।

ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। ষ্টেশনের লোকজন কমিয়া

গিয়াছে। দু'একজন যাত্রী এধার ওধার করিতেছে। মাধুরীর বিবাহ বাসরের মুখরিত উৎসব, হাওড়া ষ্টেশনের নিস্তব্ধ কোলাহল—অশোকের কোলাহলমুখর অন্তরে দুইদিকটাই ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তৃষ্ণায় অশোকের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। ভাবিল যে, সে সামান্য কিছু খাইয়া জল খাইবে। ষ্টেশনের বাহিরে যাইয়া দেখিল যে, একজন দোকানী নানাবিধ তেলেভাজা জিনিষ বিক্রয় করিতেছে। সে দুই পয়সার "বেগুনী" কিনিল। কিনিয়া পকেট হইতে ব্যাগ খুলিল, দেখিল তাহাতে একটি পয়সাও নাই। অশোক মনে মনে ভাবিয়াছিল যে তাহার পকেটে তিন-চারটা পয়সা অন্ততঃ আছে। এখন কি করিবে. তাহাই একটু ভাবিল। তারপর বেগুনী ভাজার খাবার গন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া দোকানদারকে সে ফিরাইয়া দিল। দোকানী কিছুই বুঝিল না—আপত্তিও করিল না। কারণ সে জানে যে, এতো রাত্রে যে তাহার ভাজা জিনিষ কিনিবে, গন্ধ বিচার করিয়া কিনিতে হইলে তাহার পক্ষে কেনা সম্ভব হইবে না।

অশোক আর ষ্টেশনের দিকে ফিরিলনা। পোল পার হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া ইডেন গার্ডেনের দিকে চলিল। আউটরাম ঘাটের কাছে গিয়া সে গঙ্গার ধারে গিয়া বসিল। মনে পড়িল যে, এখানে কিছুদিন আগে মাধুরীর সঙ্গে সে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বেড়াইয়াছিল। সেই দিন আর আজিকার দিন—এই পনর দিনে অবস্থার কতটা পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিতে তাহার মাথাটা

ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া উঠিল। মনে হইল, কিছুক্ষণ পরে তাহার বমি হইয়া যাইবে। এতো রাত্রে সে কোথায় যাইবে—এইখানে বসিয়া থাকিলে হয়ত পুলিশ আসিয়া তাড়া দিবে। ভোর হইতে এখনও দেরী, নইলে সে বলিতে পারিত যে সে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে। মেসে ফিরিবার পয়সা নাই, গাড়ী করিয়া যাইলেও মেস হইতে সে ভারা জুটাইতে পারিবেনা। অথচ তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, এখন বিশ্রাম করিতে না পারিলে হয়ত সে আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিবেনা। মাথা তাহার ভন্‌ভন্‌ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। হাত দিয়া মাথাটা সে চাপিয়া ধরিল। মনে হইল, যে এখন তাহার আপিসে যাওয়াই ভাল। যদিও আজ সে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ছুটি লইয়াছিল, তবুও এখন আপিসে না গিয়া তাহার কোন উপায় নাই।

সে যখন ক্রনিকল্‌ আপিসে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন প্রায় দুইটা বাজে। শিশির অশোককে দেখিয়া কহিল, এতো রাত্রে!

অশোক শুধু কহিল, ভাই ঘুমুতে এসেছি। তোমরা কাজ কর। আমি এডিটারের ঘরে তাঁর টেবিলে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

শিশির ঠাট্টা করিয়া কহিল, এই অসময়ে আপিসে শোবার জন্য আসা—তোমার ত এসব ব্যাধি ছিলনা।

অশোক হাসিয়া কহিল, ব্যাধির বীজ প্রবল হ'লেই লোক রোগাক্রান্ত হয়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এই বলিয়া অশোক বেহারাকে এক গ্লাস জল আনিতে বলিল।

শিশির বলিল, চা খাবে?

অশোক মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

শিশির বলিল, আর কোন কড়া তরল পদার্থ ?

অশোক এক নিঃশ্বাসে একগ্লাস জল নিঃশেষ করিয়া কহিল, তার জন্য উপযুক্ত স্থান ও পাত্র আছে। ক্রনিকল্ আপিসের সাহারায় তা মিলবে না।

এই কথা বলিয়া অশোক এডিটারের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

নতুন নাইট এডিটার জিজ্ঞাসা করিল,ইনিই বুঝি অশোকবাবু ?

শিশির "হুঁ" বলিয়া কাজে মন দিল। অশোকের আসার কারণটা আরও বিশেষভাবে জানিবার তার সময় ছিলনা। রাত তিনটার ভিতর ডবল কলমের সংবাদ সব প্রেসে পাঠাইতে হইবে।

অশোক টেবিলের উপর গিয়া শুইয়া পড়িল। অন্তরে যত দাহই থাকুক, চোখে ঘুম আসিয়া তাহার সমস্ত অশান্তি দূর করিল।

বাসরঘরে মাধুরীর মনে অশোকের কথা ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। গানের সাহায্যে অশোককে স্পর্শ করিতে পারিবে ভাবিয়া মাধুরী স্বামীর অনুরোধে গান গাহিতে সম্মত হইল।

সবাই খুসী হইল।

দশ

শোভনার অনুরোধে অশোক মেস ছাড়িয়া আবার বাসা বাধিল। টালিগঞ্জে একতলার একটি ফ্লাট সে ভাড়া করিল। অশোকের একটি বন্ধু ঢাকা হইতে আসিয়াছে। তাহার নাম, অসিত। এম, এ, পাশ করিয়া কলিকাতার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে নিজের বরাত সে যাচাই করিতে আসিয়াছে। অসিত অশোকের চেয়ে ছোট, তাই অশোককে দাদা বলিয়া সম্ভাষণ করে। অশোকের সঙ্গে সে থাকিতে চাহিল এবং ইহাও তাহাকে জানাইল যে, তাহার খরচ বাবদ সে অশোককে মাসিক কুড়িটাকা দিবে। অশোক অসিতের সাহচর্য্য পাইয়া খুসী হইল। ভাবিল, শোভনা একা থাকে। আর একজন লোক বাড়িলে সুবিধাই হইবে।

অসিত যখন শেয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিয়াছিল, তখন তাহার সম্বল ছিল এক টাকা ছয় আনা। অসিত ভাল কবিতা লিখতে পারে বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহার একখানা কবিতার বই ইহার মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বন্ধুমহলে "কবি" বলিয়া সে পরিচিত। অল্পদিনের ভিতরই শোভনার সঙ্গে অসিতের

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। অসিত অপরিচিতকে সহজেই নিজের করিয়া লইতে পারে। সে মিষ্টভাষী, অমায়িক।

অশোকের কাজ বাড়িয়াছে। তাই যে-সময় তাহার বাসায় থাকা উচিত ছিল, সেই সময় তাহার সঙ্ঘ লইয়া সে ব্যস্ত থাকে; সঙ্ঘের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহার কর্ম্মের নেশা আরও বাড়িয়াছে।

যোগানন্দের চেষ্টায় অশোক প্রভাত কটন মিলের পাবলিসিটি অফিসারের চাকুরী পাইয়াছে। আপাতত একশ' পঁচিশ টাকা তাঁহারা দিবেন, পরে মাহিনা আরও বাড়াইয়া দিবেন। ক্রনিকল্ আপিসে সে শীঘ্রই নোটীশ দিবে। সংবাদপত্রের কাজের প্রতি তাহার একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আছে, তাই সে নোটীশ এখনও দেয় নাই। যদিও জানে যে, সে নতুন চাকুরী ছাড়িয়া ক্রনিকল্ আফিসে অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবেনা।

অসিত একদিন অপরাহ্ণ বেলায় চা খাইবার সময় বলিল বৌদি, অশোকদার এই মধুটি কে, জানো? যার স্মরণে তিনি তাঁর "মায়ামৃগ" উৎসর্গ করলেন।

শোভনা হাসিয়া কহিল, তোমার কি বিশ্বাস যে, তোমার দাদা তাঁর সব কথা আমাকে বলেন! এই বই ছাপা হ'বার পর, আমি তো দেখেছি। আমার আনন্দ যে, আমার স্বামীর বই, এর বেশী খোঁজ করবার আনন্দ আমার নেই।

অসিত একটু ব্যথিত হইল। সে কহিল, অশোকদা বলেন যে মধু তাঁর বন্ধু, আবার বলেন যে জীবনের যে-মধুভাণ্ডের সাহায্যে

গল্পগুলি রচিত হয়েছে, তারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত—আবার কখনও বলেন যে, আসলে কথাটা ছিল বঁধু, ছাপার ভুলে সে মূর্ত্তি ধারণ করেছে মধু। মনে হয় যেন রহস্য কোথাও আছে!

শোভনা কহিল, যে-সব পুরুষ রহস্যের আবরণে নিজেকে অপ্রকাশ রাখতে চায়, তাদের পক্ষে বিয়ে করা উচিত নয়। ঠাকুরপো, তোমারও যদি কোন রহস্য থাকে, তাহলে বিয়ে করে তোমার স্ত্রীর সমস্যাকে জটিল করোনা।

শোভনা কি ইঙ্গিত করিল, অসিত সম্পূর্ণভাবে তাহা ধরিতে পারিল না। তবে এইটুকু বুঝিল যে, শোভনার কোথাও ক্ষত আছে, যার ব্যথায় সে ম্রিয়মান। শোভনার ব্যথিতমূর্ত্তি অসিতকে ব্যথা দিল।

অসিত বলিল, বৌদি, আমরা যদি বিয়ে করি, আমাদের স্ত্রীদের সমস্যা আমাদের রহস্যের জন্য বাড়বেনা। জীবনের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যারা বিফল, বিবাহিত জীবনে তারা সফল হতে পারেনা। এইতো একমাস ধরে চাকুরীর চেষ্টা করছি, সব-জায়গায় শুনি, স্থান নেই। অথচ সত্যিই স্থান নেই, তাও কি সম্ভব! কবিতা লিখি, তাতে সম্পাদক-মহল মূল্য দেননা। যদি অশোকদার মত গল্প লিখতুম, হয়তো বা কিছু হতো।

শোভনা বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমাদের মত যোগ্যব্যক্তির যে কেন স্থান হয়না, আমি বুঝতে পারিনা। তোমরা এতো জানো, শুধু জানোনা নিজের শ্রম বিক্রয় করে যথার্থ মূল্য আদায় করতে।

অসিত কহিল, তোমার মত জ্ঞান যদি মালিকদের থাকতো, আমাদের তো দুঃখ সইতে হতোনা।

শোভনা কহিল, অন্ততঃ ছেলে-মেয়ে পড়াবার কাজত পাও। যতদিন চাকুরী না পাও, ছাত্র পড়াবার ভারতো নিতে পার। আজকালত দেখি সবাই "টিউটার" রাখেন।

অসিত কহিল, এই প্রাইভেট টিউশনির জগৎটা গোলকধাঁধা। যারা প্রবেশ করেছেন, তাঁরা অপর্য্যাপ্তভাবে পান, আর যাঁরা সেই জগতে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র পাননি, তাঁদের বরাতে যে কিছুই মেলেনা।

শোভনা কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আমি আপনার জন্য চেষ্টা করবো।

শোভনার মনে পড়িল যে সতীদেবীর সাহায্য গ্রহণ করিলে সে নিশ্চয়ই এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

এমন সময় অশোক হঠাৎ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শোভনা অশোককে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

অশোক শোভনাকে কহিল, ম্যানেজিং ডিরেক্টার এক্ষুনি যেতে বলেছেন। পরিষ্কার কাপড় ও জামা বের করে দাও।

অসিত বিস্মিত হইয়া কহিল, হঠাৎ এই আমন্ত্রণ কেন? তোমার দিকে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের দৃষ্টি দেবার নতুন কি কারণ ঘটতে পারে?

অশোক হাসিয়া কহিল, হয়তো বলবেন যে ক্রনিকল আপিসে

আমার স্থান নেই। তাতে সুবিধেই হবে, হাতে চাকুরীও আছে, আর বরখাস্ত করলে অন্ততঃ সব মাহিনা পরিষ্কার করে দিতে হবে। সে লাভও তো কম লোভের নয়।

অশোক তাড়াতাড়ি মাথা ধুইয়া জামা কাপড় পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

শোভনার অন্তর যেন কোন এক আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

অশোক যখন ম্যানেজিং ডিরেক্টারের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নীচে বেহারার কাছে স্লিপ্ লিখিয়া দিল। বেহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দোতালায় লইয়া গেল। একটি সুসজ্জিত কক্ষে গিয়া সে বসিল। চারিদিকের সমস্ত দেয়ালটা যেন বইয়ের আলমারী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার সস্ত্রীক ঘরে প্রবেশ করিয়া অশোককে অভিবাদন জানাইলেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার দুঃখিতভাবে কহিলেন, অশোক বাবু, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি একটু জরুরী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি। এক্ষুনি আসব। আপনি বরং আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করুন।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এই আমাদের অশোকবাবু, যার প্রশংসা তোমার কানে এসে পৌঁছেচে। আমাদের আপিসে এঁর সমকক্ষ কর্ম্মী খুব কম আছে।

অশোক কি বলিবে ভাবিয়া পাইলনা, নিজের প্রশংসা শুনিয়া

চমকিত হইয়া গেল। তাই সে কুন্তলাদেবীকে নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল।

কুন্তলাদেবী স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি তোমার কাজে যাও। আমি অশোকবাবুর সঙ্গে আলাপ করি। অশোকবাবুত আর আমাদের পর নন—উনি কিছু মনে করবেন না।

বলিয়াই অশোকের দিকে চাহিলেন।

অশোক কহিল, আপনার কাজে আপনি যান। আমি অপেক্ষা করব।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন।

কুন্তলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, আপনার কথা এতো শুনি, অথচ আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই। আপনার মত কর্ম্মীর সঙ্গে পরিচয় না থাকা যে আমার পক্ষে অন্যায়, তার জন্য আপনি মাপ করবেন!

কুন্তলাদেবীর কণ্ঠস্বর মমতা-জড়িত, তাই অশোক খুসী হইল।

অশোক কহিল, আপনার সঙ্গে পরিচয় লাভ আমার পক্ষে সৌভাগ্য।. আমাদের কাজ আপনাদের প্রশংসা দাবী করে, এই সংবাদ আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কুন্তলাদেবী কহিলেন, আমি এতোদিন এই কথাটাই মিঃ রায়কে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, দেশের এই সব যুবক-কর্ম্মীদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না করে দিলে এঁরা দেশের

জন্য কি করে তাদের সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দেবেন। তাই আমারই ইচ্ছায় তিনি আপনাকে নিউজ এডিটার করে দেবেন স্থির করেছেন। আপাততঃ একশ টাকা পাবেন, পরে কর্পোরেশন ট্রেনিং কলেজ থেকে আপনাকে আর একশ' টাকার বন্দোবস্ত করে দেবঁ।

অশোক কোনদিন এতো আদরের কণ্ঠস্বর শোনে নাই। তাই সে প্রথমটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু কুন্তলাদেবী যেন তাহার চিত্তের সমস্ত মমতা দিয়া কথাগুলি বলিল, তাই সে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। কুন্তলাদেবীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল, মনে হইল বাহিরের প্রচারিত কলঙ্ক কথা কত মিথ্যা, সেই ভুল ভাঙিবার জন্যই যেন কুন্তলাদেবী তাহাকে ডাকিয়াছেন।

অশোক উৎফুল্ল হইল তথাপি সংযতভাবেই বলিল, কিন্তু এখন যিনি নিউজ এডিটার আছেন, তাঁর কি হবে?

কুন্তলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, অশোকবাবু, আমি কারুর প্রতি অন্যায় করবনা—অথচ গুণীকে সম্মান করতে চাই। সুশীলবাবু এখন থেকে ম্যানেজমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করবেন।

অশোক সঙ্কোচের সঙ্গে কহিল, আপনার এই অনুগ্রহ আমি মনে রাখব। কিন্তু আমি স্থির করেছিলাম যে, সংবাদপত্রের কাজ ছেড়ে নতুন চাকুরী গ্রহণ করবো।

কুন্তলাদেবী ধীরে ধীরে কহিলেন, অশোকবাবু, জানি আপনার মনে অভিযোগ আছে, হয়তো অভিমানে অন্য কোথাও

চলে যাবেন। কিন্তু দেশের কাজে নেবে এই মান-অভিমান আপনাকে ছাড়তে হবে। এতোকাল আপনার যোগ্য পুরস্কার হয়নি বলেই আপনি আমাদের এই ভাবে শাস্তি দেবেন, তা' আপনার কাছ হ'তে আমরা আশা করিনে। আমি যতদিন আছি, অশোকবাবু, আপনার প্রতি অবহেলা যাতে না হয়, সেই ভার আমিই গ্রহণ করলাম।

অশোক চোখ চাহিয়া তাকাইল, দেখিল অনবগুণ্ঠিতা কুন্তলাদেবীর উজ্জ্বল প্রশান্তমুখে কোন প্রতারণার চিহ্ন নাই। অশোক বুঝিল যে, কুন্তলাদেবীর আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া দেশসেবার খেয়াঘাটে সে অপেক্ষা করিতে পারে। ঝড় যতই ভীষণ হউক না কেন, সে অশঙ্কিত চিত্তে তাহার জীবনতরণী সেই বিক্ষুব্ধ সাগর মাঝে ভাসাইয়া দিতে পারে। কুন্তলাদেবীর কণ্ঠে দরদ আছে, তাঁহার দৃষ্টি শঙ্কা দূর করে, তাই তাঁহার আমন্ত্রণে অশোকের সমস্ত সংশয় দূর হইল।

অশোক খুব অপরাধীর মত কহিল, আপনার আশ্বাসবাণী আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা অবহেলিত হই বলেই অভিযোগ মনের ভিতর জমাট বেঁধে ওঠে, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের মন বিষিয়ে ওঠে।

কুন্তলাদেবী হাসিলেন। বলিলেন, আমাদের ভুল বুঝে যে-বিরুদ্ধতা আপনারা সৃষ্টি করেন, তাতে আমরা ব্যথা পাই। আপনাদের ব্যথিত করে তোলায় আমাদের কোন লাভ নেই, এই সহজ কথাটা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য, তাই বা কেন

আপনারা বিশ্বাস করেন। আপনাদের যদি কিছু ব্যথা দিয়ে থাকি, তা না জেনেই দিয়েছি। ব্যথা দেব বলে আঘাত করার মত ঔদ্ধত্য আমাদের নেই।

অশোকের মনে হইল যে এতকাল তাহারা মিথ্যাই এই সব নেতাদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিয়া আসিয়াছে। কুন্তলা-দেবীর কোমলকণ্ঠের সহানুভূতিপূর্ণ বাণী তাহার ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা দূর করিল।

অশোক অনুতপ্তস্বরে কহিল, মানুষকে জানতে হলে সান্নিধ্য লাভ ছাড়া উপায় নেই, দূরে থাকলে শুধু নালিশই মনে জাগে।

কুন্তলাদেবী সহজস্বরে কহিলেন, তার জন্যই আপনাকে আমরা আমাদের কাজের ভিতর চাই, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আমাদের অপরাধের অঙ্ক যতটা ভাবেন, ততটা নয়।

অশোক কহিল, কিন্তু আমাদের কর্ম্মপথতো আলাদা। আপনি জানেন যে, আমি আমার সঙ্ঘের পণে আবদ্ধ, তার আদর্শ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার অধিকার আমার নেই।

এমন সময় বেহারা চা ও নানাবিধ দেশী-বিলাতী খাবার লইয়া আসিল। কুন্তলাদেবী নিজহাতে চা প্রস্তুত করিয়া প্লেটে খাবার সাজাইয়া অশোককে খাইতে অনুরোধ করিলেন। অশোক কিছুই অস্বীকার করিতে পারিলনা।

কুন্তলাদেবী নিজে এককাপ চা প্রস্তুত করিয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, আপনার সঙ্ঘের কথা আমি শুনেছি। আপনার সঙ্ঘের আদর্শের সঙ্গে আমার মনের মিল আছে বলেই

আপনাকে আমি ডেকেছি। আমি আপনার সঙ্ঘের ভিতর দিয়ে কাজ করতে চাই।

অশোক যেন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, আমাদের সঙ্ঘে ত নারী-সভ্য নেই। আর আপনি আমাদের সঙ্গে কি করে কাজ করবেন। আমাদের পরিকল্পিত সমাজে ধনীর শোষণ চলতে পারবেনা। সেই শোষিতবর্গের ব্যথার সঙ্গে তাল ফেলে কি আপনি চলতে পারবেন?

কুন্তলাদেবীর চোখদুটি হাসিতে ভরিয়া উঠিল। কহিলেন, আপনারা ভাবেন যে দেশকে সেবা করবার অধিকার একমাত্র আপনাদেরই আছে। আমরা নারী হয়েছি বলে দেশসেবার প্রাঙ্গণে আমাদের স্থান নেই এবং ধনীর গৃহে পালিত হয়েছি বলে দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবোনা। আপনাদের এই একচোখো দৃষ্টিকে আমি প্রশংসা করতে পারিনে। যদি সত্যিই আপনাদের সঙ্ঘকে কার্য্যকরী করতে চান এবং তার প্রভাব বাড়াতে চান, তাহলে কাউকে অস্বীকার করে এগিয়ে গেলে চলবে না।

অশোক যেন একটু লজ্জা পাইল। সে স্বীকার করিল যে, তাহাদের আদর্শ প্রচার ও অনুসরণ করিতে যিনি রাজী হইবেন, তাহারই সঙ্ঘে স্থান হইবে। এইভাবে সঙ্ঘ লইয়া বহু আলোচনা চলিল, কুন্তলাদেবীর সহানুভূতি দেখিয়া অশোক মুখর হইয়া উঠিল। এবং সে কি ভাবে এই সঙ্ঘের কাজ চালাইবে, তাহার প্রোগ্রাম উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া গেল। অশোক দুঃখের সঙ্গে কহিল,

শুধু কর্ম্মী ও অর্থের অভাবে আমাদের আদর্শদ্বারা দেশবাসীদের প্রভাবান্বিত করতে পারছি না।

কুন্তলাদেবী উৎসাহ দিয়া কহিলেন, আমি আপনাকে কর্ম্মী ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করব। আমি চাইনে যে, দেশের দুঃখ ক্রমশঃ আর্ত্তনাদে গিয়ে পৌঁছাবে। দেশবাসীর ম্লানমুখে যদি হাসি না ফোটানো যায়, দেশসেবায় ব্রতী হ'বার কোন সার্থকতাই থাকেনা অশোকবাবু। আমিও চাই যে চারিদিকের প্রতারণা থেকে আমার দেশবাসী উদ্ধার পাক।

অশোক খুসী হইল। কুন্তলাদেবীর সাহায্য পাইবে জানিয়া সে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। এবং সাহায্য তাহার প্রয়োজন বলিয়া সে নিজের মনে উত্তেজনা বোধ করিল। মনে হইল যে, তাহার আদর্শ এখন সারাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া গৃহীত হইবে। এই ভাবে দেশবাসী নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইলে দেশের দারিদ্র্য-সমস্যাকে সে নতুনভাবে সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে।

অশোক কি কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় একটি যুবতী ঘরে ঢুকিয়াই থামিয়া গেল।

কুন্তলাদেবী বলিলেন, এস মন্দিরা, ইনিই আমাদের অশোকবাবু। এর কথা নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ।

মন্দিরা ক্ষুদ্র নমস্কার দিয়া কহিল, এঁর কথা শুনেছি অনেক কিন্তু আলাপ নেই। শুনেছি, এঁদের নাকি আমাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ বেশী।

মন্দিরা ভাল নাচ-গান করিতে পারে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

যখনই দুর্ভিক্ষ বা জলপ্লাবনের দুঃখনিবারণের জন্য কোন নাচগান চ্যারিটির বন্দোবস্ত হয়, মন্দিরা সেখানে সম্মুখের স্থান পায়। তাহার নাচ-গান যুবকমহলে প্রিয়। অশোক মন্দিরার নাচ-গান দেখিয়াছে, প্রশংসা করিয়াছে এবং আভিজাত্যের মদিরায় প্রমত্ত বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আলাপ হইবে, এই কথা সে ভাবে নাই।

কুন্তলাদেবী কহিলেন, অশোকবাবু তোমাদের ঘৃণা করেন না, করেন তোমাদের শ্রেণীকে। তোমার মত সুন্দরী ও গুণী মেয়েকে অশোকবাবু ঘৃণা করবেন, এ ধারণা তোমার কেন হল! রাজনীতির আসরে তুমিও তো অপরিচিত নও। অশোকবাবু নিজে কর্ম্মী, তিনি তোমাদের মত কর্ম্মীকে অশ্রদ্ধা করতে পারেন না।

অশোক বিপদে পড়িল। সে কহিল, আমাদের কাজে আপনার সাহচর্য্য পেলে খুসী হব।

মন্দিরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা কোচে আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, কিন্তু অশোকবাবু, আমরা শাসনও করি, শোষণও করি। আমরা যে বর্জ্জনীয়।

কুন্তলাদেবী কহিলেন, গ্রহণ না করলে বর্জ্জনের সুযোগ নেই। তোমাকে গ্রহণ করে যদি তাঁরা বোঝেন যে, তোমাকে বর্জ্জন করা ছাড়া আর উপায় নেই, নিশ্চয়ই তোমাকে বর্জ্জন করবেন। কি বলেন অশোকবাবু?

অশোক অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। সে কি বলিবে, বুঝিতে

পারিতেছে না। মন্দিরা ঘরের ভিতর আসিয়া যেন অশোকের চিন্তাধারাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। অশোক নীরবে সম্মতি জানাইল।

কুন্তলাদেবী কহিলেন, অশোকবাবু, মন্দিরাকে আপনি সহ-সম্পাদক করে নিন্, অর্থ ও সভ্যের অভাব হবে না। চাঁদা আদায় করতে মন্দিরার দক্ষতা আছে, আর সভ্য জোটাবার কৌশল মন্দিরা নিশ্চয়ই জানে।

এই কথা বলিয়া কুন্তলাদেবী মন্দিরার দিকে তাকাইলেন।

মন্দিরা হাসিয়া কহিল, আমিই যদি সব করি, অশোকবাবুই আমার অধীনে কাজ করবেন, তার অধীনে আমি কেন কাজ করব?

কুন্তলাদেবী কহিলেন, তুমি অশোকবাবুর অধীনে নও, তুমি কাজ করবে তার নির্দ্দেশানুসারে, সঙ্ঘের নীতির সঙ্গে তোমার কর্ম্মপদ্ধতি মিলিয়ে নিতে হবে।

মন্দিরা অশোককে লক্ষ্য করিয়া কহিল, সঙ্ঘের নীতি যদি ভেঙে যায়।

অশোক কহিল, আপনার দণ্ড পেতে হবে।

মন্দিরা হাসিয়া কহিল, দণ্ড যদি নিতে হয়, আপনার কাছে মাথা পেতে নেব। কিন্তু আপনার সভ্যদের হাতে নয়।

কুন্তলাদেবী হাসিলেন।

অশোক বলিল, আমাদের সভাপতির সম্মতি নিতে হবে।

কুন্তলাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের সভাপতি কে?

অশোক কহিল, আমারই বন্ধু অমিয় বসু।

মন্দিরা টক্ করিয়া কহিল, ওঃ, এই অমিয়বাবুর সঙ্গেই তো আমাদের সিপ্রার বিয়ে হ'বে বলে কথা ছিল। হঠাৎ সিপ্রার বিয়ে হয়ে গেল এক আই, সি, এস-এর সঙ্গে। আমি অমিয় বাবুকে চিনি।

কুন্তলাদেবী কহিলেন, বেশ ভালই হোল। তাহ'লে কোন গোলই থাকবেনা। আর যদি কিছু থাকে, মন্দিরা সেই বাধা সহজ করে নিতে পারবে।

এই বলিয়া কুন্তলাদেবী চোখ টিপিয়া একটু হাসিলেন!

মন্দিরা মুচকি হাসিয়া কহিল, কি যে বল বৌদি। সঙ্ঘ-ভক্ত সন্তানদের আপত্তি খণ্ডন করবার শক্তি কি আমাদের আছে।

কুন্তলাদেবী অশোকের দিকে তাকাইলেন। অশোক আশ্বাস দিয়া কহিল, বাধা কেন দেব? যারা সত্যিই আমাদের নীতির অনুরাগী, তাদের আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব। শুধু ভয় হয় যে, মন্দিরাদেবী কি আমাদের নীতি গ্রহণ করতে রাজী হবেন? দেশের সর্ব্বহারাদের সুরে সুর মিলিয়ে কি মন্দিরাদেবীর সঙ্গীত ধ্বনিত হবে?

কুন্তলাদেবী অশোককে প্রচুর আশ্বাস দিলেন। অশোক আনন্দের সঙ্গে তাহা গ্রহণ করিল।

কুন্তলাদেবীর অনুরোধে মন্দিরা একখানা গান করিল, সেই গান অশোককে তৃপ্তি দিল।

প্রাণ ভরিয়া তৃপ্তি গ্রহণ করিয়া অশোক বিদায় গ্রহণ করিল। তখনও ম্যানেজিং ডিরেক্টার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন নাই। কুন্তলাদেবী ও মন্দিরা নীচের ফটক পর্য্যন্ত অশোকের সঙ্গে আসিল। অশোক আর আপিসে না গিয়া বাড়ি ফিরিল।

এগার

অশোকের জীবনে যেন নতুন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আপিসে আসিয়া জানিল যে সে নিউজ-এডিটার পদে উন্নীত হইয়াছে। আপিসের সহকর্ম্মীরা এক সভা করিয়া অশোককে অভিনন্দন জানাইল। এডিটার সভাপতিরূপে অশোকের বহু প্রশংসা করিলেন। অশোক এই ভাবিয়াই বিস্মিত হইল যে, এডিটার যদি তাহার সম্বন্ধে এতো উচ্চ মতই পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এতোদিন ইহার পরিচয় সে [illegible]য় নাই কেন? মানুষের সৌভাগ্যের দিনে এতো সূক্ষ্ম বিচার করিতে কেহ চাহে না, অশোকও চাহিল না। সে অবহেলার ঘাট অতিক্রম করিয়া সবার কাছেই প্রশংসার আসন পাইতেছে, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। এডিটার এখন তাহার সঙ্গে সব সময় যুক্তি করিয়া কাজ করেন এবং অশোকের কথাই প্রায় সব সময় টিকিয়া যায়। অশোক বিস্মিত হয়।

অশোকের সঙ্ঘের কাজ লইয়া মন্দিরা ব্যস্ত থাকে। সে নিজে চাঁদা উঠাইতে যায়। বহু সভ্য সে করিয়াছে। নারী সভ্যদের

একটা ভিন্ন সেক্‌সন হইয়াছে। সেদিন মন্দিরার অধিনায়কত্বে নারী-সভ্যরা একটা জলসার বন্দোবস্ত করিয়াছিল! তাহাতে টিকিট বিক্রয় করিয়া ভাল অর্থ আদায় হইয়াছে। নতুন "ষ্টাডি সার্কল" স্থাপিত হইয়াছে—সেখানে নানাবিধ অর্থ-নীতি ও রাজ-নীতি বিষয়ে আলোচনা হয়। কলিকাতার নানাস্থানে সভা আহূত হয়, নারী-সভ্যরা মহিলা সভা আহ্বান করেন। প্রায় সমস্ত জেলায় ব্রাঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে। অনেকস্থলে মাহিনা দিয়া কর্ম্মচারী রাখা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে নানা পুস্তিকা লিখিয়া মফঃস্বলে প্রচারিত হয়, সেই অনুসারে মফঃস্বলে প্রচার-কার্য্য চলে। গ্রামে গ্রামে কর্ম্মীদের পাঠান হইয়াছে। অমিয় ও অশোকের নাম দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল, তাহাদের প্রশংসায় কাগজে প্রবন্ধও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়।

এই সময় সদস্য সভার নির্ব্বাচনের হুজুগ আসিয়া পড়িল। এই সঙ্ঘকে বশ করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতে লাগিল। অশোক কুন্তলাদেবীকে কথা দিয়াছে যে, তাহাদের সঙ্ঘ ম্যানেজিং ডিরেক্টারের দলকে সমর্থন করিবে। ম্যানেজিং ডিরেক্টার খুসী হইয়া অশোককে একদিন অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, এই নির্ব্বাচনের হাঙ্গামা মিটিয়া গেলেই তিনি অশোকের জন্য কর্পোরেশনের ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপকের কাজ ঠিক করিয়া দিবেন। সবই স্থির হইয়া আছে, শুধু সার্ভিস কমিটি হইতে একদিন পাশ করিয়া লইলেই হইবে। অশোক প্রাণ মন দিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

সঙ্ঘের সভায় অশোকের প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই একজন আপত্তি উঠাইয়াছিল। কিন্তু মন্দিরা সভ্যদের যখন জানাইয়া দিল যে ক্রনিকল্ আপিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ রায়ের দলকে সাহায্য করিলে তাহাদের দল সদস্য সভায় সঙ্ঘের নীতি অনুসারেই কাজ করিবে, তখন সবাই খুসী হইল। সভ্যদের প্রতি মন্দিরার প্রভাব দেখিয়া অশোক বিস্মিত হইল। এই কথাটা একবার অশোককে খোঁচা দিল যে,মন্দিরার বিরুদ্ধে তাহাদের যদি কোন দিন যাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহাদেরই সঙ্ঘ ছাড়িয়া দিতে হইবে। মন্দিরার এই প্রভাব অশোকের ভাল লাগিল না, কিন্তু মন্দিরার সাহায্য ব্যতীত এখন তাহাদের চলিবার উপায় নাই, কারণ কুন্তলাদেবীর কাছে অর্থ চাহিতে হইলে মন্দিরার সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

খগেন একদিন অশোককে কহিল, মন্দিরার হাতে সব কাজের ভার দিয়ে ভাল করনি।

অশোক বলিল, কেন? মন্দিরা তো সভ্যদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করে। অমিয়কে আমি বলে দিয়েছি কাজকর্ম দেখতে।

খগেন হাসিয়া কহিল, সভ্যদের পরামর্শ নেয় কিন্তু তুমি তো জানো যে, সে-সব সভ্য তারই ইঙ্গিতে চালিত। যারা তাকে ঘিরে থাকে, তারা সর্ব্বদাই মন্দিরাদেবীর আজ্ঞার অপেক্ষা করে মাত্র। মন্দিরা দেবীর প্রভাব মানে কুন্তলাদেবীর প্রভাব, একথা নিশ্চয়ই মানবে।

অশোক কহিল, দেখ, নির্ব্বাচনের সময় আপিসে কাজের চাপ

এতো বেশী, তা-তো তুমি সবই জানো। তাই সঙ্ঘের কাজ নিয়ে মন্দিরার উপর নির্ভর করতে হয়। মন্দিরাকে বাদ দেওয়া যে এখন মুস্কিল।

খগেন বলিল, তার মানে, কুন্তলা দেবীর জাল এতো সুনিপুণ ভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে, এখন তোমাদের কোন উপায় নেই। কিন্তু এই সাবধান-বাণী আমি তোমাকে আগে বলেছিলাম, তুমি শোননি।

অশোক স্বীকার করিয়া কহিল, তুমি জানো না যে কুন্তলা দেবীর কাছে আমি কতটা সম্মান ও দরদ পাই। তার ভিতর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা' আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তবে, এখন কুন্তলা দেবীকে অস্বীকার করে সঙ্ঘের কাজ চালানো অসম্ভব। মন্দিরার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গেলে সভ্যরা মন্দিরাকেই চাইবে, আমাদেরই যেতে হবে। কিন্তু এতো বড় প্রতিষ্ঠান যে গড়ে উঠেছে, তাতে মন্দিরার দানকে অস্বীকার করতে পারোনা।

খগেন একটা সিগারেট জ্বালাইয়া কহিল, প্রতিষ্ঠানকে বড় করা হয়েছে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য, এই সহজ ব্যাপারটা তোমার পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল।

অশোক সবই বুঝিল কিন্তু স্বীকার করিতে পারিল না।

খগেন দুঃখের সঙ্গে কহিল, আমার ভয় হয়, পাছে তুমি এই জালে পড়ে মারা না যাও। তোমাকে তাঁরা হজম করতে পারবেন না। তা' তাঁরা জানেন, তাই তোমাকে শক্তিহীন করে তাঁরা বর্জ্জন করবেন।

অশোক আশঙ্কিত হইল, মনে মনে ভাবিল যে, এই সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়িয়া সে বাহির হইয়া যাইবে। আবার তারপর ভাবিল যে, খগেনের আশঙ্কা ভিত্তিহীনও তো হইতে পারে।

অশোক বলিল, তোমার আশঙ্কার কোন ভিত্তি নেই। খগেন, মানুষকে অবিশ্বাস করলে তাকে অশ্রদ্ধা করা হয়। অশ্রদ্ধা করার মত ব্যবহার আমি কুন্তলা দেবীর কাছ থেকে আজ পর্য্যন্ত পাইনি।

খগেন অশোকের দিকে তাকাইয়া রহিল—কোন কিছু বলিল না। আপিসে খগেন হইল অশোকের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। অশোকের অনুরোধেই খগেন সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছে, কিন্তু মন্দিরার প্রভুত্ব সে সহিতে পারে না। সঙ্ঘের সভায় খগেন মন্দিরার বিরুদ্ধতা করে, তাই সেখানে সে কলহপ্রিয় বলিয়া পরিচিত এবং মন্দিরার অনুগত সভ্যদ্বারা নিন্দিত। অশোকের প্রতি বিশ্বাস আছে বলিয়াই খগেন সঙ্ঘ ত্যাগ করে নাই, কুন্তলা দেবীর বিরুদ্ধতার ভয়ে নয়।

অশোক এখন বারটায় আপিসে যায় এবং তাহাকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। নির্ব্বাচনের সময় কাজ অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গিয়াছে এবং নির্ব্বাচনসংক্রান্ত কোন ব্যাপার তাহার অনুমতি ব্যতীত ছাপা হইতে পারে না। সেদিন আপিসে রওনা হইবার সময় অশোক দেখিল যে, শোভনা একটা চাদর গায়ে দিয়া

শুইয়া আছে। কাছে গিয়া লক্ষ্য করিল যে, শোভনার চোখদুটি ছল ছল করিতেছে। কপালে হাত দিয়া বুঝিল যে, তাহার জ্বর হইয়াছে।

অশোক অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল, তোমার আবার শরীরটা খারাপ হয়েছে। এতো ঠুনকো শরীর থাকলে গরীবের সংসার যে অচল হ'য়ে উঠবে।

শোভনা মুখ ফিরিয়া একবার তাকাইল কিন্তু কিছুই বলিল না। মাথার যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাইতেছিল, অশোকের কথার নমুনা দেখিয়া নিজের কষ্ট জানাইবার মত উৎসাহ আর তাহার রহিল না।

অশোক বলিল, যদি জ্বর বাড়ে, অসিতকে ডাক্তার এনে দেখাতে বলো।

এই বলিয়া অশোক চলিয়া গেল। শোভনা কাঁদিতে লাগিল। অশোক স্বেচ্ছায় শোভনাকে আদর করে না। চাহিয়া আদর আদায় করিবার মত রুচিও শোভনার নাই। অসুখের সময়ও যদি একটু সহানুভূতি না পায়, মানুষ ব্যথা পায় সবচেয়ে বেশী। কিন্তু অশোকের বাহিরের জীবনের আকর্ষণ এতো বেশী যে, নিজের গৃহের ট্র্যাজেডির দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। অশোকের এই ঔদাসীন্য শোভনার জীবনক্ষেত্রকে সাহারায় পরিণত করিয়াছে।

অসিত দুপুরে বাড়ী আসিয়া দেখিল যে, শোভনা শুইয়া আছে। শোভনা সতীদেবীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া অসিতের জন্য একটি "টিউশন" সংগ্রহ করিয়াছে। সতীদেবীর এক বোনের

মেয়েকে পড়াইতে হয়—সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। মাসে পঞ্চাশ টাকা ব্যবস্থা হয়েছে।

শোভনার অসুখ জানিয়া অসিতের মনটা খারাপ হইয়া গেল।

অসিত শোভনার তক্তপোষে বসিয়াই কহিল, বৌদি, তোমার যে অসুখ, তা' অশোকদা জেনে গেছেন?

শোভনা চোখ বুজিয়া কহিল, তিনি জেনে গেলে আমার অসুস্থতা কিছু কমবে বলে তোমার বিশ্বাস?

অসিত লজ্জা পাইল। সে কহিল, তবুও অশোকদার জানা থাকা উচিত যে, তোমার অসুখ হয়েছে।

শোভনা চোখ চাহিয়া কহিল, ঠাকুরপো, তুমিও পুরুষ মানুষ, তাই তোমার কাছে বলতে বাধে। কিন্তু পুরুষেরা জয়ী হয় শুধু তাদের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে। আমরা দুর্ব্বল, আঘাত দিতে পারিনে, তাই শুধু সইতে হয়। তোমরা জানোনা যে, আমরা আঘাত দিলে তোমরা একেবারে ভেঙে পড়বে, কারণ তোমরা সইতে পারো না।

অসিত ক্ষণকালের জন্য চুপ হইয়া রহিল। তারপর কহিল, বৌদি, তুমি হয়তো ব্যথা পাও, তাই ভুল বোঝ। কিন্তু অশোকদা তোমায় ভালবাসেন। অশোকদার মত লোক কখনও অন্যায় করতে পারেন না।

শোভনা হাসিবার চেষ্টা করিল। কহিল, তোমরা ভাবো যে, আমার স্বামী এতো শিক্ষিত, এতো ন্যায়বান, তাই আমার কি

দুঃখ থাকতে পারে! তুমি জানো ঠাকুরপো যে, দারিদ্র্যকে আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু তোমার দাদার সহানুভূতিহীন ব্যবহার মেনে নিতে পারিনি। তোমার দাদা যত গুণীই হোন্, স্ত্রীর অন্তর তাতে পূর্ণ হয় না। তার কঠোরতা আমাকে পলে পলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তোমার দাদার চিত্তের দরদের দ্বার আমার কাছে চিররুদ্ধ। কে তার অন্তরের রসভাণ্ড আমার কাছে শুষ্ক করে দিয়ে গেল, আজ পর্য্যন্ত সে খবর আমি পেলাম না। পাবার জন্য আমি ব্যস্তও নই। শুধু তোমার দাদার শুষ্ক রসভাণ্ডে আমি কোন রস ও মায়া সৃষ্টি করতে পারলাম না, এই দুঃখ নিয়েই আমায় মরতে হবে।

অসিত শোভনার ব্যথায় ব্যথিত হইল এবং অশোকের রূঢ়তায় ক্ষুব্ধ হইল। তবুও অশোকের পক্ষ হইয়া সে কহিল, এমন তো হ'তে পারে যে, তুমি অশোকদাকে ভুল বিচার করছো।

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া শোভনা কহিল, ভুল! ঠাকুরপো, তাই হোক্। কিন্তু আমার এত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা তো তুমি জানো না, তুমি বুঝবেও না। তুমি যদি বিয়ে কর, স্ত্রীকে যত আঘাতই দাও, কখনো স্ত্রীর প্রতি উদাসীন থেকো না। তোমাদের ঔদাসীন্য আমরা সইতে পারিনে। তোমাদের দণ্ড আমরা মাথা পেত নেব, কিন্তু তোমাদের দণ্ডহীন কঠিন নিরপেক্ষ ব্যবহার সব চেয়ে চরম দণ্ড, সেই দণ্ড থেকে আমাদের মুক্তি দিয়ো।

অসিত কিছুই বুঝিতে পারিল না, সমস্ত ব্যাপারটা যেন

তাহার নিকট রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। তবে এইটুকু বুঝিল যে শোভনার অন্তর ব্যথায় বিবর্ণ এবং সেই ব্যাপারে অশোকের দায়িত্ব উপেক্ষার বস্তু নয়। এই ভাবিয়া অসিত অশোকের উপর অসন্তুষ্ট হইল। বাহিরে অশোকের এতো প্রশংসা, অথচ ঘরে তাহার বিরুদ্ধে এতে অভিযোগ, অসিত যেন এই রহস্য ঠিক ধরিতে পারিল না।

অসিত কহিল, বৌদি, তুমি কিছু খাবে ?

শোভনা মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। শোভনার ক্লান্ত চোখ আবার বুজিয়া গেল।

অসিত ভারাক্রান্ত চিত্তে ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

বার

ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ রায় অশোকের উপর সন্তুষ্ট। এখন অশোককে সঙ্গে লইয়া তিনি নানা নির্ব্বাচন সভায় যোগ দেন, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লোকের কাছে ভোট চাহিতে যান। অশোক যুবকমহলে প্রিয়, তাই সে মিঃ রায়ের কাছেও প্রিয়। নির্ব্বাচনের সময় বিরুদ্ধদলকে ভোটারের কাছে হেয় করিতে যুবকদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। মন্দিরার দলবল মিঃ রায়ের পার্টির লোকদের সাহায্য করে। এই ভাবে মিঃ রায়ের পার্টির প্রার্থীগণ জনসমাজে প্রিয় হইয়া উঠিল। ক্রনিকল্ আপিসে নির্ব্বাচনব্যাপারে সম্পূর্ণ অধিকার অশোকের— কাহার সংবাদ ছাপাইতে হইবে, কাহার নির্ব্বাচনী ইস্তাহার ফেলিয়া দিতে হইবে, কাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে এবং কাহার সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতে হইবে, এই সব অশোক ব্যতীত আর কেহ ভাল জানেনা। তাই এডিটারের পর্য্যন্ত অশোকের নিকট আসিয়া জানিয়া যাইতে হয় যে, কাহার বিরুদ্ধে কতটা লিখিতে হইবে। এই ভাবে অশোকের

প্রতিপত্তি আপিসে বাড়িয়া গেল। এমন দিনও হয় যে, মিঃ রায় আপিসে আসিয়া অশোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, অথচ এডিটার জানিতেও পারেন না।

অশোক অনাস্বাদিত ক্ষমতা লাভ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। দিনরাত সে পরিশ্রম করিতে লাগিল মিষ্টার রায়ের পার্টির জন্য। ইহা সে বুঝিয়াছিল যে মিঃ রায়কে অবলম্বন করিয়াই এই সংসারের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাকে স্থান করিয়া লইতে হইবে।

কুন্তলাদেবী একদিন বলিলেন, অশোকবাবু, আপনি মিঃ রায়ের পার্টির জন্য যে পরিশ্রম করছেন, একথা আমাদের স্মরণ থাকবে। আপনার সহায়তা না পেলে আমাদের পার্টির পক্ষে মুস্কিল হতো। আমাদের ওপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করে থাকতে পারেন —আমাদের সাহায্য যদি কখনও দরকার হয়, তা' আপনার জন্য অকুণ্ঠিতভাবে আমরা দেব।

অশোক কহিল, আপনার পার্টিকে সাহায্য করা যে এখন আমার সঙ্ঘের কাজ। সঙ্ঘের কাজকে অবহেলা করা যে অন্যায়, তা' জানি বলেই আজ আমার বিশ্রামের অবসর নেই।

কুন্তলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, আমরা কি সঙ্ঘের বাইরে?

অশোক চমকিত হইল, তারপর কহিল, আপনারাই তো সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক। আপনার সাহায্য না পেলে আমাদের সঙ্ঘ আজ এতো সবল ও সতেজ হতে পারতোনা। সঙ্ঘের ইতিহাসে আপনার দান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা' চিরকাল স্বীকার করব।

কুন্তলাদেবী খুসী হইলেন। কহিলেন, দেশের কাজে আপনাদের যতটুকু সহায়তা করতে পারি, তা' আমি করব। আমার অর্থ আছে, তাই আমি দিই—আপনারা গ্রহণ করতে যেন কোন দিন কুণ্ঠাবোধ না করেন।

অশোক ভাবিল যে সত্যিই কুন্তলাদেবী "দেবী"। তাহা না হইলে এতো অকুণ্ঠিতচিত্তে অযাচিতভাবে সঙ্গোপনে দেশের জন্য এতটা দান কে-ই বা করেন এবং কেনই বা করেন। ধনীর গৃহে কুন্তলাদেবীর মত দেবী আছে বলিয়াই আজও ধনীর ঐরাবত দাঁড়াইয়া আছে, আজও ধনতান্ত্রিকের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষেপিয়া উঠিতেছেনা। অশোক ইহাও ভাবিল যে, ঘরে ঘরে কুন্তলাদেবী থাকিলে যুবক বাংলাকে এই দুর্গতি ও অপচয়ের জালে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত না।

নির্ব্বাচনের হুজুগের মধ্যে অশোক মাঝে মাঝে কুন্তলাদেবীর কাছে আসিয়া পরামর্শ করিয়া যাইত। সহসা মন্দিরার সঙ্গে দেখা হইত, আলাপ হইত এবং একটু বিদ্রূপাত্মক রসিকতাও চলিত। অশোক কুন্তলাদেবীর কাছে আসিয়া মনে শক্তি ও শান্তি লাভ করিত, মন্দিরার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া খুসী হইত। পুরুষকে খুসী করিবার অস্ত্র মন্দিরার অভাব ছিলনা।

অশোকের বাহিরের আকর্ষণ যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার পারিবারিক সমস্যা ততই জটিল হইতে লাগিল। শোভনার অসুখ কিছুতেই কমিতেছেনা, মাঝে মাঝে কমিলেও আবার বাড়িয়া ওঠে। অশোকের এক বন্ধু ডাক্তার শোভনাকে দেখিতেছে।

অসিত শোভনার সেবা-শুশ্রূষা করে, ডাক্তার ডাকিয়া আনে, ওষুধ কিনিয়া লইয়া আসে। শোভনার শরীর ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। শোভনার দাদা রাঁচিতে। শোভনা অসুস্থ হইয়া পড়িয়া আছে, তাই সংসার চালাইবার সমস্ত হাঙ্গামা অশোকের স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। অসিত সবই করে, কিন্তু প্রয়োজনমত সমস্ত টাকা অশোকের আনিয়া দিতে হয়। সংসার চালাইতে হাতে টাকা না থাকিলে কি করিতে হয়, তাহা অশোক এতোকাল জানিতনা এবং কি কৌশলে শোভনা সেই সব দিনগুলি চালাইয়া লইত, সেই বিষয়ে অশোক সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই হাতে টাকা না থাকিলে অশোক মুস্কিলে পড়ে। আপিসে এখন তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি—তাই যখনই সে ম্যানেজারের কাছে মাহিনার অগ্রিম অংশ চায়, তখনই সে পায়। কিন্তু তাহার মনে হয় মাঝে মাঝে ম্যানেজার যদি অগ্রিম মাহিনা দিতে অস্বীকার করেন, তখন তাহার কোন উপায়ই থাকিবেনা। অথচ শোভনা এতোদিন কি ভাবে চালাইত, সেই রহস্য তাহার কাছে অমীমাংসিতই রহিয়া গেল। অশোক এইটুকু বুঝিল যে, স্ত্রীর সহযোগিতা ব্যতীত সংসার চালানো যায়না এবং স্ত্রীর অসুখ হইলে স্বামীর গতিবিধির স্বাধীনতা বাড়িলেও সংসার বেশীদিন সচল থাকিতে পারেনা।

বিমান রাঁচি হইতে শোভনার অসুখের সংবাদ শুনিয়া অশোকের কাছে চিঠি লিখিয়াছে। এবং শোভনাকে রাঁচি পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছে।

অসিত আসিয়া বলিল, অশোকদা, বৌদিকে এখানে ভালভাবে চিকিৎসা করাও, নয় তাঁকে রাঁচি পাঠিয়ে দাও। স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকলে নিশ্চয়ই বৌদির শরীর ভাল হবে।

অশোক শান্তভাবে কহিল, যে-স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যকর হাওয়া না পেলে নষ্ট হয়, তাকে ক'দিনই বা রাখা যায়।

অসিত এই বিদ্রূপের ভিতর রূঢ়তা অনুভব করিল এবং তাহার মনে পড়িল যে, শোভনাও অশোকের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছিল।

অসিত অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, তোমার প্রাণ নেই, অশোকদা, নইলে বৌদির অসুখ নিয়ে এতো কঠিন কথা বলতে পারতে না।

অশোক কহিল, দরিদ্রের দরদ দেখাবার সুযোগ কোথায়, অসিত। আমার অর্থের প্রয়োজন, তাই আমি স্ত্রীর অসুখের সময়ও তাকে নিয়ে রাঁচি যেতে পারিনে। কারণ, কলকাতা ছাড়া আমার পক্ষে মুস্কিল। আমার অর্থ নেই, তাই শোভনাকে পাঠাবার বন্দোবস্তও করতে পারিনে। যেই পথ দিয়ে দুঃখ-দারিদ্র্য এসে জীবনকে আক্রান্ত করেছে, সেই পথের হাওয়াতে স্নেহ, মমতা সব উবে গেছে। তাই আজ আমি অর্থহীন ও স্নেহহীন।

অসিত ব্যথা পাইল। সে বলিল, তুমি আমাকে বল, আমি বৌদিকে রাঁচি রেখে আসি। আমাকে অনুমতি দাও, আমি অর্থের বন্দোবস্ত করছি। কিন্তু তুমি অর্থের মরীচিকার পেছনে ঘুরে নিজেকে হারিয়ে ফেলছ। অর্থবান লোকের স্নেহ ও মমতা বেশী, একথা তুমি বিশ্বাস করলেও আমি করিনে।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ইহাই স্থির হইল যে, অসিত শোভনাকে রাঁচি রাখিয়া আসিবে। শোভনা এই সিদ্ধান্ত জানিতে পারিয়া অসম্মতি জানাইয়া বলিল, আমার রাঁচি যাবার দরকার নেই, আমি এখানেই ভাল হয়ে যাব।

অশোক শোভনাকে অনেক বুঝাইল এবং বলিল যে, নির্বাচনের হুজুগ কমিয়া গেলে সে ছুটী লইয়া শোভনার সঙ্গে রাঁচি গিয়া থাকিবে। শোভনা সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া রাঁচি যাইতে সম্মত হইল এবং বারবার করিয়া বলিল, আমি সেখানে গিয়ে তোমার অপেক্ষায় দিন গুণব। তোমাকে সেখানে পেলে আমার শরীর ভাল হয়ে যাবে।

এই কথা বলিয়া শোভনা একটু আদর মিশ্রিত হাসি হাসিল।

অশোক আশ্বাস দিয়া কহিল, তোমার অপেক্ষাকে আমি সার্থক করব। তুমি ভাল হয়ে ওঠো।

শোভনার চোখের কোণে জল দেখা দিল।

তের

সদস্য সভার নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে। মিঃ রায়ের পার্টি জিতিয়াছে এবং অধিকাংশ স্থানেই তাহার দলের প্রার্থীগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অশোক নিজের পরিশ্রমকে সার্থক মনে করিল। চতুর্দ্দিকের জয়োল্লাসের মধ্যে যেন অশোকের মনটা দমিয়া গেল। এতোদিন এতো কাজ ছিল, কিন্তু এখন যেন মনে হইল যে, তাহার কাজ নিঃশেষ হইয়াছে—সে বিশ্রাম চায়।

আজ কুন্তলা দেবীর বাড়ীতে সঙ্ঘের সমস্ত সভ্যদের চায়ের নিমন্ত্রণ। কিন্তু অশোক সকাল বেলাই অমিয়র বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। অমিয় বাসায় ছিল না—সে অমিয়র বসিবার ঘরে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতে লাগিল। অশোক অমিয়র সঙ্গে আজ দেখা করিবে, পরামর্শ করিবে এবং নতুন কার্য্যক্রমের আলোচনা করিবে।

কিছুক্ষণ পরে অমিয় ফিরিয়া আসিয়া অশোককে দেখিয়া বিস্মিত হইল। বলিল, তোমার সঙ্গে দেখা করবার আমার খুব দরকার ছিল। এসেছ, ভালই হয়েছে।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, সকাল বেলায় কোথায় বেরিয়েছিলে?

অমিয় হাসিয়া কহিল, সেই কথা বলবার জন্যই তোমার কাছে যেতাম। আমি এখন মন্দিরার কাছে গিয়েছিলাম। তাকে বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি।

অশোক হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর ভাবিল যে অমিয় বিদ্রূপ করিতেছে। তাই অশোকও ঠাট্টা করিয়া কহিল, মন্দিরার মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে সব উপাসকের ভীড়, তার ভিতর তুমি স্থান করে নিতে পারবে?

অমিয় কহিল, আমিও ভীড়ের অংশবিশেষ ছিলাম। কিন্তু দেবী আমার উপর সুপ্রসন্ন হয়েছেন, তাই তাঁকে পূজা করবার ভার আমার উপরেই পড়েছে।

অশোক কহিল, তুমি কি সত্যই বলছ যে, মন্দিরাকে তুমি বিয়ে করবে?

অমিয় হাসিয়া জানাইল যে, সে মন্দিরাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

অশোক অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, তুমি সঙ্ঘের সভাপতি হ'য়ে তার সহকারী সম্পাদককে বিয়ে করবে, তা' আমাদের পক্ষে অনুমোদন করা কঠিন। তাতে সঙ্ঘের নিন্দা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

অমিয় বলিল, আমাদের সঙ্ঘ তো চিরকুমার সঙ্ঘ নয় এবং আমাদের বিবাহের বিরুদ্ধে কোন পণও নেই। সঙ্ঘের সভ্যদের ভিতর বিবাহ হ'লে সঙ্ঘের আদর্শের সঙ্গে কোন বিরোধই সৃষ্টি

হবে না। বিবাহ-ব্যাপার ব্যক্তিগত, অন্ততঃ বলতে পার যে সমাজগত, কিন্তু তাতে সঙ্ঘের অনুমোদনের কোন প্রয়োজন হবে না এবং আশা করি সঙ্ঘও অনুমোদন করা বা না করা নিয়ে ব্যগ্রতা প্রকাশ করবে না।

অমিয়র কথা অশোক মানিল না। অশোক কহিল, আমাদের সঙ্ঘ পরিণয় স্থাপনের বুরো নয়, একথা আমাদের জানতে হবে। আমরা মিলেছি দেশের দুঃখ চিন্তা করতে, দেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করতে। দেশের কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমরা নারী সভ্যদের বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে পরিণয়ের প্রস্তাব উপস্থাপিত করব, সেই আদর্শ আমাদের ছিল না। নারী সভ্যদের আনবার উদ্দেশ্য প্রণয়ের সুযোগকে সুবিস্তৃত করে দেওয়া নয়, তাদের সাহায্যে দেশের নারীশক্তিকে আমাদের উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করা নারীচিত্ত জয় করার জন্য, নারীদেহের কামগন্ধপূর্ণ স্বাদ পাবার জন্য সঙ্ঘ স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না।

অশোকের কঠিন মন্তব্য শুনিয়াও অমিয় অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। অমিয় শান্তভাবে কহিল, অশোক, তুমি ভুল বোঝবার চেষ্টা করো না। সঙ্ঘের কাজকে আমরা কোনদিন অবহেলা করিনি। সঙ্ঘের কোলাহলের বাইরে আমাদের পরিচয় যদি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়, আমরা যদি নিজেদের সামাজিক বন্ধনের মাঝে পেতে চাই, তোমার বরঞ্চ তাতে খুসী হওয়া উচিত, কারণ তাতে অসঙ্গতি কোথাও নেই। সঙ্ঘের সাহায্যে যদি

আমি অন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেম, তোমার বাধা দেবার অধিকার তখন ছিল।

অশোক কহিল, কুন্তলা দেবী জানেন?

অমিয় হাসিয়া কহিল, কুন্তলাদেবীর উৎসাহেই তো এই বিবাহ স্থির হয়েছে। আমিও প্রথমটা তোমার মতই আপত্তি করেছিলাম কিন্তু কুন্তলাদেবী বুঝিয়ে দিলেন যে, বিবাহ করলে সঙ্ঘের কেউ আপত্তি করবে না। বরঞ্চ বিবাহ না করলে সঙ্ঘের বদনাম রটতে পারে।

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

অমিয় কহিল, কুন্তলাদেবী বললেন যে মন্দিরা যেখানে দুর্ব্বল, সেখানে আপত্তি প্রকাশ করলেই কলঙ্কের পথকে সুপ্রশস্ত করে দেওয়া হবে।

অশোক কহিল, তার মানে, মন্দিরা যা চায়, তা' সহজে ছাড়বে না। কিন্তু মন্দিরা যদি এমন বস্তু চায় যা সে পেতে পারে না।

অমিয় দুঃখিত হইল, মন্দিরার প্রতি শ্লেষোক্তি তাহার ভাল লাগিল না। মন্দিরা চাহিলে অমিয়র অদেয় কিছু নাই। মন্দিরা চাহিবে অমিয়র কাছে—তাহাতে অশোকের এতো আপত্তি কেন, তাহা অমিয় বুঝিল না।

অশোক বুঝিল যে, তাহার অজ্ঞাতসারে অনেক কিছুই ঘটিয়া গিয়াছে। মন্দিরা ভালবাসিয়াছে, কুন্তলাদেবী সাহায্য করিয়াছে এবং অমিয় বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে—অথচ এই সব সে

কেহই জানে না। তাহাকে জানাইবারও কেহ প্রয়োজন অনুভব করে নাই। দেশসেবার মন্দিরে দেহ ও মন লইয়া এই "দেওয়া-নেওয়া" খেলাকে সে সমর্থন করিতে পারিল না।

অশোক দুঃখিত মনে কহিল, তুমি বিয়ে করে সুখী হও, কিন্তু এই সঙ্ঘের সঙ্গে আমার কোন যোগ থাকবেনা।

অমিয় কহিল, তুমি আমার উপর রাগ করতে পার, কিন্তু সঙ্ঘকে তুমি ছাড়বে কেন? সঙ্ঘ তো তোমারই সৃষ্টি।

—মিথ্যা কথা, অমিয়, সঙ্ঘও মন্দিরাই গড়েছে, মন্দিরাই ভাঙ্গবে। কুন্তলাদেবীর অধিনায়কত্বে তা ঘটতে বেশী দেরী হবে না।

—ভুল করবে, অশোক। এখন সঙ্ঘ ছেড়ে দিলে, তা' কুন্তলাদেবীর দলের হাতেই যাবে।

—যাক্, তাদের হাতে তুলে দেবার পথকেই ত তুমি সহজ করে দিচ্ছ।

—মন্দিরাকে বিয়ে করব বলে আমি তোমার দল ছেড়ে যাব, এই আশঙ্কা তোমার হওয়া উচিত নয়।

অশোক তবুও খুশী হইল না। অশোকের সমস্ত প্রোগ্রাম যেন বদলাইয়া গেল। সে যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহা বলিতে পারিলনা। সঙ্ঘের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে অমিয়র সঙ্গে আলোচনা করিবার উৎসাহ তাহার আর রহিল না। কুন্তলাদেবীর উপরও তাহার রাগ হইল।

অমিয় কহিল, বিকেলে কুন্তলাদেবীর ওখানে যাচ্ছ ত?

—যেতে পারি, শুধু এই ছোট দুটি কথা বলিয়া অশোক উঠিল। অমিয় আর একটু বসিতে অনুরোধ করিল। অশোক কাজের অজুহাতে চলিয়া গেল।

রাস্তায় বাহির হইয়া সে ভাবিতে লাগিল যে এখন সে কোথায় যাইবে। হঠাৎ তাহার শোভনাকে মনে পড়িতেই সে স্থির করিল যে, ছুটি লইয়া রাঁচি চলিয়া যাইবে।

বৈকালে কুন্তলাদেবীর বাড়ীতে বহু সভ্যের সমাগম হইয়াছিল। নারী সভ্যের ভিতর মন্দিরা মণিপুরী নৃত্য দেখাইল, চিত্রা গান গাহিল, সুলতা আবৃত্তি করিল, কুন্তলাদেবী একটি ছোট বক্তৃতা করিলেন এবং সভ্যদের অভিনন্দন জানাইলেন। সভ্যরা সবাই কুন্তলাদেবীর প্রতি খুসী হইল, তাঁহার অনাড়ম্বর চাল-চলন তাহাদের প্রীত করিল, এবং তাঁহার প্রশান্ত সুন্দর সতেজ মূর্তি তাহাদের বিমুগ্ধ করিল। অশোক দূর হইতে চা খাইয়া চলিয়া আসিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা কুন্তলাদেবী আপিস হইতে অশোককে টেলিফোন করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। কুন্তলাদেবীর বাড়ীতে অশোকের অবাধগতি, তাই সে বিনাবাধায় দোতালায় উঠিয়া গেল। বসিবার ঘরের বেল বাজাইতেই—বেহারার পরিবর্তে কুন্তলাদেবী নিজে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাজ দেখিয়া অশোক থতমত খাইয়া গেল—এতদিন সে কুন্তলাদেবীকে দেখিয়াছে, কিন্তু কখনও তাঁহাকে এমন অসংযত দেখে নাই। আজ তাঁহার চোখে ছিল সুর্মা, তাহার ওষ্ঠ ছিল সিঁদুরের

মত লাল, কপোলভাগ ছিল কুঙ্কুমের মত আরক্তিম। গায়ের জামা লোভীর মত দেহকে যেন আঁটিয়া ধরিয়াছে, তাই দেহের বিত্ত ও নগ্ন বাহুর শুভ্রতা যেন অপরূপ মায়া সৃষ্টি করিল।

কুন্তলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, আজ একটি পার্টিতে গিয়েছিলাম —এখনও সেই পোষাকেই আছি। এই পোষাকে কি আমায় মানায় অশোকবাবু? গ্রীবা বাঁকাইয়া তিনি এই কথাগুলি বলিলেন, তাই কানের ঝুমকা দুটী দুলিয়া উঠিল।

অশোক কিছুই বলিল না।

কুন্তলাদেবী কহিলেন, আপনি জানেন যে মন্দিরার অমিয় বাবুর সঙ্গে বিয়ে। আপনি অবিবাহিত থাকলে আপনার জন্যও ক'নে জুটিয়ে দিতাম।

এই রসিকতা অশোকের ভাল লাগিল না। কহিল, জানি!

—শুনেছি আপনার অমত।

—তা-ও শুনেছেন?

—মন্দিরা কি অমিয় বাবুর যোগ্য নয়?

—কে কার যোগ্য, সে কথা আমি কি করে বলব!

—মন্দিরাকে আপনার ভাল লাগে না, অশোকবাবু? এই বলিয়া কুন্তলাদেবী এক চোখ দিয়া চাহিলেন, এবং অকারণেই হাসিয়া উঠিলেন। হাসির উত্তেজনায় দেহের বস্ত্রখণ্ড ডানদিকের হাত বাহিয়া চৌকির হাতের উপর দিয়া মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। লালসার বহ্নিতে কুন্তলাদেবী যেন প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন, অশোক চোখ নত করিল।

কুন্তলাদেবী লুণ্ঠিত আঁচলের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কহিলেন, মন্দিরা ও অমিয়বাবুর বিবাহোপলক্ষে সঙ্ঘ থেকে একটা অভিনন্দন বন্দোবস্ত করা উচিত।

অশোক হাসিল এবং সে তাচ্ছিল্যের সুরে কহিল, কে কাকে বিয়ে করবে, তাতে আমরা অভিনন্দন জানাতে যাবো কেন? আমাদের অভিনন্দন প্রস্তুত থাকবে নির্য্যাতিত দেশপ্রেমিকের জন্য।

কুন্তলাদেবী অখুসী হইলেন। তিনি কঠিন স্বরে কহিলেন, তারাও তো দেশকর্ম্মী, আমার ইচ্ছে যে সঙ্ঘ থেকে ওদের অভিনন্দন দেওয়া হয়।

অশোক কহিল, এদের অভিনন্দন দিলে আমরা লোকসমাজে নিন্দিত হব।

কুন্তলাদেবী কহিলেন, লোকসমাজের ভয় দেখাবেন না। লোকসমাজকে ভোলাবার শক্তি আমাদের আছে।

অশোক সহজভাবে কহিল, আপনার পার্শ্বে অনুগ্রহ ভিক্ষার্থীদেরই লোকসমাজ বলে ভুল করবেন না।

কুন্তলাদেবী গর্ব্বের সঙ্গে কহিলেন, আমাদের অনুগ্রহ থেকে যারা বঞ্চিত, তারাই আমাদের বিরুদ্ধতা করে। আমাদের অনুগ্রহের লোভ কেউ জয় করেছে, তা জানি না। আর জানলেও তাদের জয় করতে আমরা জানি।

অশোক কহিল, সব মানুষ অত লোভী নয়।

কুন্তলাদেবী অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। তিনি কহিলেন,

আজ আপনাকে ডেকেছি এই জন্যে যে অভিনন্দনের ভার আপনাকেই বহন করতে হবে।

অশোক কহিল, ক্ষমা করবেন। এই অভিনন্দনের সঙ্গে আমার কোন সহানুভূতি নেই। আর অভিনন্দন দিতে হ'লে, সঙ্ঘের সভা ডাকতে হবে। আমরা দুজনেই স্থির করলে ত হবে না।

কুন্তলাদেবী শান্তভাবে কহিলেন, আমার ইচ্ছাই কি আপনার সভ্যদের কাছে যথেষ্ট নয়! এটুকু জানবেন অশোকবাবু, আমার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করবার মত শক্তি আপনার সঙ্ঘের সভ্যদের নেই। যার আছে, তাকে সঙ্ঘ ছাড়তেই হবে।

অশোক চুপ করিয়া রহিল। এই গর্ব্বিত নারীর এই গর্ব্বিত আচরণের পর তাহার বাধা দিবার কোন শক্তিই রহিল না। সঙ্ঘ যে কোন্ ঘাটে বাঁধা পড়িয়াছে এবং কাহার ইঙ্গিতে চলিতেছে তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

কুন্তলাদেবী কহিলেন, আজ উঠি, আপনি অভিনন্দনের ভার নেবেন, এই আমার ইচ্ছে।

অশোক চৌকি ছাড়িয়া কহিল, অভিনন্দনের ভার অন্যের উপর দেবেন। যে বিবাহকে আমি অসঙ্গত ভাবি, তাকে জনসমাজের মাঝে অভিনন্দিত করবার অভিনয়ে আমার কোন সংযোগ নেই, জানবেন।

কুন্তলাদেবী একবার চোখ চাহিয়া অশোকের দিকে তাকাইলেন। তারপর কহিলেন, আচ্ছা তা-ই হবে।

এই ত জীবন

অশোক নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল। কুন্তলাদেবী বারান্দায় দাঁড়াইয়া আলোকিত রাস্তার মাঝে অশোকের চলিয়া যাওয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যাহারা বাঁচিতে চায়, নিজেকে পীড়ন করিয়া যাহারা বাঁচিতে চায়, তাহারা কোন রকমে টিকিয়া থাকিতে পারিলেও জীবনকে ভোগ করিতে পারে না, সংসারের রূপ, রস ও গন্ধের বিচিত্র পরিবেশন তাহাদের অনাস্বাদিত থাকিয়া যায়। হায়রে মানুষ, ভোগ করিতে এতো সঙ্কোচ, নিজেকে বঞ্চিত করার এতো প্রচেষ্টা কেন? কি-ই বা লাভ!

চোদ্দ

পনর দিন হইল অমিয় ও মন্দিরার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অশোক বিবাহে যোগ দেয় নাই বটে, তবে বৌভাতের নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছে। অমিয়র অনুরোধ সে এড়াইতে পারে নাই। সাতদিন হইল সঙ্ঘ অমিয়-মন্দিরাকে অভিনন্দন দিয়াছে। তাহাতে সে যোগ দেয় নাই। অশোক সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু সেই ছাড়পত্র অমিয় এখনও সঙ্ঘের সভায় উত্থাপিত করে নাই।

সেদিন সকাল বেলায় অশোক ঘুম হইতে উঠি উঠি করিতে-ছিল, এমন সময় আপিসের পিয়ন একখানা চিঠি লইয়া আসিল। অশোক পিয়নকে দেখিয়া বলিল, আজকের কাগজ কোথায়?

পিয়ন অশোকের হাতে চিঠি দিয়া বলিল, আজকের কাগজ নেই বাবু।

পিয়ন চলিয়া গেল।

অশোক চিঠি খুলিয়া দেখিল যে ম্যানেজিং ডিরেক্টার তাহাকে চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন এবং আপিসে যাইয়া মাহিনা লইয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

অশোক চিঠি পাইয়া বিস্মিত হইল না, যদিও এই চিঠির জন্ত সে প্রস্তুত ছিলনা। আজ মনে পড়িল কুন্তলা দেবী একদিন তাহার মাহিনা বাড়াইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টারও তাহার কর্পোরেশনের চাকুরী করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। আজ ইহাও মনে পড়িল যে তাহার পরিকল্পিত গল্প তাহার হাত হইতে কি ভাবে কুন্তলাদেবীর হস্তগত হইয়াছে। অথচ কুন্তলাদেবীর বাড়ীতে তাহার কি রকম প্রশংসা, তাহার উপকার ভুলিবার নয় বলিয়া কি রকম আশ্বাস! সব কথাই তাহার মনে হইল, শুধু মনে হইল না যে ধনমদে মত্ত মালিকের কাছ হইতে ইহার বেশী আশা করা যায় না। কি যাদুমন্ত্রে সে ভুলিয়াছিল, তাহা সে জানেনা, কিন্তু সে যে ভুলিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। কুন্তলাদেবীকে সে বিশ্বাস করিয়াছিল, ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং মন্দিরার হাতে স[illegible]জের ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহা সে কখনও ভাবে না[illegible] যে মতের অমিল হইলে, মনের অমিল হইবে এবং মনের অমিল হইলে, তাহার চাকুরী যাইবে। সে অনুগ্রহ চাহিয়াছে বটে, কিন্তু ভিক্ষা করে নাই; সে অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল বটে, কিন্তু নিজের সম্মান কখনও খোয়াইতে দেয় নাই; তাহার অনুগ্রহের প্রয়োজন ছিল বটে, কিন্তু সে কখনও দাসত্বকে মানিয়া লয় নাই। এই সব চিন্তার মধ্যে হঠাৎ শোভনার কথা তাহার মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর কথাও স্মরনপথে উদিত হইল। নিজের সমস্ত অতীত জীবনের দিকে একবার সে ফিরিয়া তাকাইল কিন্তু

সম্মুখে প্রসারিত সুদীর্ঘ পথের দিকে সে কিছুতেই তাকাইতে পারিল না—ক্লান্ত চোখ দু'টি যেন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই কুন্তলাদেবীর শেষ দিনকার ঘটনা স্মরণ করিয়া সে হাসিল। এখনো ইচ্ছা করিলে সে চাকুরী রাখিতে পারে, কিন্তু দুঃখে, ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

অশোক আবার শুইয়া পড়িল এবং ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নানা অসংলগ্ন চিন্তা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর মত তাহার মাথার মধ্যে ভিড় করিয়া আসিল। ভিড়ে সে তাহার বিষয়বস্তু হারাইয়া ফেলিল এবং কোন্ এক সময়ে সত্যিসত্যিই সে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

স্নান করিয়া ভাত খাইয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। আজ আর তাহার আপিস নাই। ছুটি চাহিবার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে যাইবে ভাবিয়াছিল কিন্তু তাহার যাইতে হইবে না। যে ছুটি চাহিবার জন্য তাহার এত সঙ্কোচ ছিল, আজ সেই সঙ্কোচের কোন সুযোগ রহিল না। তাহার সম্মুখে সুদীর্ঘ ছুটি—ভাবিল, আপিস হইতে মাহিনা আনিয়া সে রাঁচি চলিয়া যাইবে।

অপরাহ্ণের সময় ক্রনিকল্ আপিসের লাইব্রেরীয়ান আসিয়া উপস্থিত হইল।

অশোক তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিল, কি খবর?

লাইব্রেরীয়ান সহানুভূতির সুরে কহিল, আমি সব শুনেছি, অশোক। তোমাকে আপিস থেকে ছাড়াবার জন্যে এডিটারের যে

উৎসাহ দেখেছি, তাতেই বুঝেছিলুম যে তোমাকে যেতে হবে। বিশেষতঃ চাকুরী রাখবার কৌশলও যখন তোমার জানা নেই।

অশোক কহিল, আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টারের জন্য যা' করেছি, তা' বোধ হয় জানোনা, জানলে ভাবতে যে এর পরও তাঁরা কি করে আমার সম্পর্ক ত্যাগ করেন!

লাইব্রেরীয়ান বলিল, বোধ হয়, তার জন্যই চাকুরী গেল।

অশোক হাসিল।

লাইব্রেরীয়ান বলিল, চাকুরী গেছে, তাতে দুঃখ করোনা। এতবড় কলকাতার সহরে অর্থ ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিলেই হলো। যে ক'টা টাকা এখানে পেতে, তা' তুমি অল্প আয়াসে পেতে পার।

অশোক লাইব্রেরীয়ানের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কলিকাতার পথে অর্থ ছড়ানো আছে, এই সংবাদ তাহার জানা নাই. ইহার সম্যক অর্থ কি, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল।

লাইব্রেরীয়ান কহিল, তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর, আমি তোমাকে মাসে একশত টাকার ব্যবস্থা ক'রে দেব।

অশোক খুশী হইয়া কহিল, কি ভাবে তুমি আমার সাহায্য চাও?

লাইব্রেরীয়ান বলিল, তোমার সঙ্ঘের সভ্যদের সম্বন্ধে আমি যে-সব সংবাদ চাই, তা যদি তুমি প্রতিমাসে আমাকে দাও, প্রতিমাসে আমি তোমাকে টাকা দিয়ে যাব।

অশোক অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল।

লাইব্রেরীয়ান নিম্নস্বরে কহিল, তাদের পলিটিকাল কর্ম্মপদ্ধতি কি, কি ভাবে তারা কাজ করে, কেন এবং কোথায় তারা কাজ করে, কাদের সাহায্য তারা গ্রহণ করে, অর্থ কোথা থেকে আসে, সভ্য বাড়াবার উপায় কি, এসব বিষয়েই খবর দরকার।

অশোক অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, তার মানে, তুমি সি, আই, ডিকে সাহায্য করবে আমার সংবাদের উপর নির্ভর করে। তুমি ভেবেছ যে আমার অর্থের প্রয়োজন, তাই অর্থের খাতিরে আমি তোমার মত সব হীন কাজ করব। তুমি জানো, মানুষের পক্ষে এর চেয়ে হীন কাজ নেই, আর তুমি যে এই কাজে লিপ্ত, এসংবাদ তো আমি জানতুমনা।

লাইব্রেরীয়ানটি কোন রকম বিক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া কহিল, যদি আমার কাজ জানতেই পারবে, তাহলে আমাকে এই কাজে কেনই বা রাখবে। তবুও আমার প্রস্তাব রইল, যদি কোনদিন অর্থের প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ করো। সংবাদ বিক্রী করে অর্থ পাবে, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই।

অশোক বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সি, আই, ডির লোক, অথচ স্বদেশী কাগজে কি করে কাজ পেলে?

লাইব্রেরীয়ান হাসিল। বলিল, এর ভিতর অনেক রহস্য আছে। সেই জগতে যদি প্রবেশ করতে চাও, সবই ধীরে ধীরে জানতে পারবে।

অশোক বলিল, তোমাকে ধন্যবাদ। অর্থ উপার্জ্জনই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়।

এই কথা বলিয়া অশোক নিজের অন্তরেই কাঁপিয়া উঠিল।

লাইব্রেরীয়ান বলিল, যদি কোন দিন অর্থোপার্জ্জন তোমার চরম লক্ষ্য হয়, আমার সহযোগিতা তখনও তুমি পাবে।

ইহা বলিয়া সে চলিয়া গেল। অশোক মনে মনে ভাবিল যে, লাইবেরীয়ানকে যত বোকা বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, তত বোকা সে নয়। হয়ত, বোকা সাজিয়া থাকাই তাহার প্রয়োজন।

সন্ধ্যা পার হইয়া রাত্রি হইল। অশোক বিছানা ছাড়িয়া উঠিল না। রাত্রে খাওয়া শেষ করিয়া আবার সে বিছনায় শুইয়া পড়িল। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না—কিন্তু রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালের ঘণ্টাগুলিও কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার কিছুই করিতে ভাল লাগিল না—এমন কি, কিছু ভাবিতেও ভাল লাগিল না।

অসিত এখনও কিছুই জানে না। বাড়ীর চাকরেই সংসার চালাইতেছে।

বেলা দশটার সময় একটা টেলিগ্রাম আসিল। অশোক খুলিয়া দেখিল যে, বিমান শোভনার অসুখ গুরুতর হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে এবং তাহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

টেলিগ্রাম পাইয়া অশোকের সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। মানুষের জীবনে দুঃখের বরষা যখন নামে, তখন তাহা অবিশ্রাম-গতিতেই নামিতে থাকে। সমস্ত কোণ হইতে কালো মেঘ দলে দলে আসিয়া তাহার জীবনাকাশ ছাইয়া ফেলে—বরষার ধারায় পথঘাট পিচ্ছিল হইয়া যায়।

অশোক ভাবিল যে আপিসে গিয়া সে টাকা লইয়া আসিবে, কিন্তু

তাহার মনটা মুষড়াইয়া গেল। আপিসে যাইতে যেন তাহার ইচ্ছা হইল না, আপিসের কর্ম্মকর্ত্তাদের কাছে হাত পাতিতে যেন সে সঙ্কোচ বোধ করিল, যদিও সে জানে যে প্রাপ্য টাকাই সে চাহিতে যাইতেছে।

একবার ভাবিল সে অমিয়র কাছে যাইবে। অমিয়র সঙ্গে মন্দিরা সম্পর্কীয় ব্যাপার লইয়া যত মতের অনৈক্যই সৃষ্টি হউক না কেন, অশোকের বিশ্বাস আছে যে অমিয় তাহার প্রয়োজনের সময় তাহাকে ফিরাইয়া দিবে না, দিতে পারে না।

অমিয়র বাসায় গিয়া শুনিল যে অমিয় বাসায় নাই। অশোক চলিয়া আসিতেছিল, এমন সময় মন্দিরা আসিয়া বলিল, বন্ধু বাড়ী নেই বলে কি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে নেই?

অশোক শুষ্কমুখে কহিল, বন্ধুর অবর্ত্তমানে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে দেখা করা রীতিসঙ্গত নয়।

মন্দিরা হাসিয়া কহিল, আমাকে বন্ধুভাবে ত একদিন গ্রহণ করেছিলেন। তারপর মন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি অসুখ করেছে?

অশোক মলিন মুখে কহিল, অসুখ আমার নয়, অসুখ আমার স্ত্রীর। মন্দিরা উদ্বেগের সঙ্গে কহিল, তিনি তো রাঁচি আছেন, আপনি আজই চলে যান না কেন?

অশোক চুপ করিয়া রহিল।

মন্দিরা কহিল, আপনার স্ত্রীর অসুখ—তা'তো বল্লেননি। আমরাও তো রাঁচি যাব ভাবছিলুম, তা'হলে সেখানে আগেই যেতাম।

অশোক কহিল, অমিয় কখন আসবে?—তার সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন ছিল।

মন্দিরা কহিল, আমার কাছে বললে যদি হয়, তা'হলে বলতে পারেন। ওঁর আসতে বোধ হয় দেরী হবে।

অশোক কি করিবে, কি বলিবে, স্থির করিতে পারিতেছিল না। মন্দিরা আবার কহিল, আপনার প্রয়োজন বলুন না।

মন্দিরার কণ্ঠে নারীর মমতার সুর বাজিয়া উঠিল—সেই সুর অশোকের প্রাণস্পর্শ করিল।

অশোক কহিল, অমিয়র কাছে গোটা পঁচিশ টাকা নিতে এসেছিলাম। মন্দিরা কোন কথা না বলিয়া অশোককে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া দ্রুতগতিতে উপরে চলিয়া গেল। একশ' টাকার একখানা নোট হাতে করিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

অশোক একশ টাকা দেখিয়া বলিল, আমার অত টাকার প্রয়োজন নেই।

মন্দিরা কহিল, মাপ করবেন অশোকবাবু, খুচরা টাকা [illegible]। আপনি এই নোটখানাই নিন্। হয়তো প্রয়োজন হতেও পারে।

অশোক কম্পিতহস্তে নোটখানি গ্রহণ করিল, ম্লানচোখে মন্দিরার দিকে একবার তাকাইল—মন্দিরা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দিরা অশোককে শ্রদ্ধা করে, তাই তাহার দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অশোকের দিকে সে তাকাইতে পারিল না। অশোককে অর্থ সাহায্য করিতে পারিয়া সত্যই সে তৃপ্তি বোধ করিল।